# রূপতীর্থ খাজুরাহো

শঙ্কু মহারাজ



অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

**Rupatirtha Khajuraho**

a travelogue by Sanku Maharaj
Published by Amar Sahitya Prakashan
7 Tamer Lane, Cal-9
Price Rs. 12/

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রকাশক :
এন. চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
সাধন গুপ্ত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিন্টিং
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

অঙ্কন : শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

বারো টাকা

ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে
প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালকবৃন্দের করকমলে

ঢাকুরিয়া,
২৭শে জুন,

## লেখকের কয়েকখানি ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

পঞ্চ-প্রয়াগ

গহন-গিরি-কন্দরে

তমসার তীরে তীরে

পঞ্চবটী

গঙ্গাসাগর

মানালীর মালঞ্চে

হিমতীর্থ-হিমাচল

অমরতীর্থ-অমরনাথ

পুণ্যতীর্থ প্রভাস

মন-দ্বারকায়

রাজভূমি-রাজস্থান

মধু-বৃন্দাবনে ( ব্রজ, বন ও মহাবন পর্ব )

চতুরঙ্গীর-অঙ্গনে

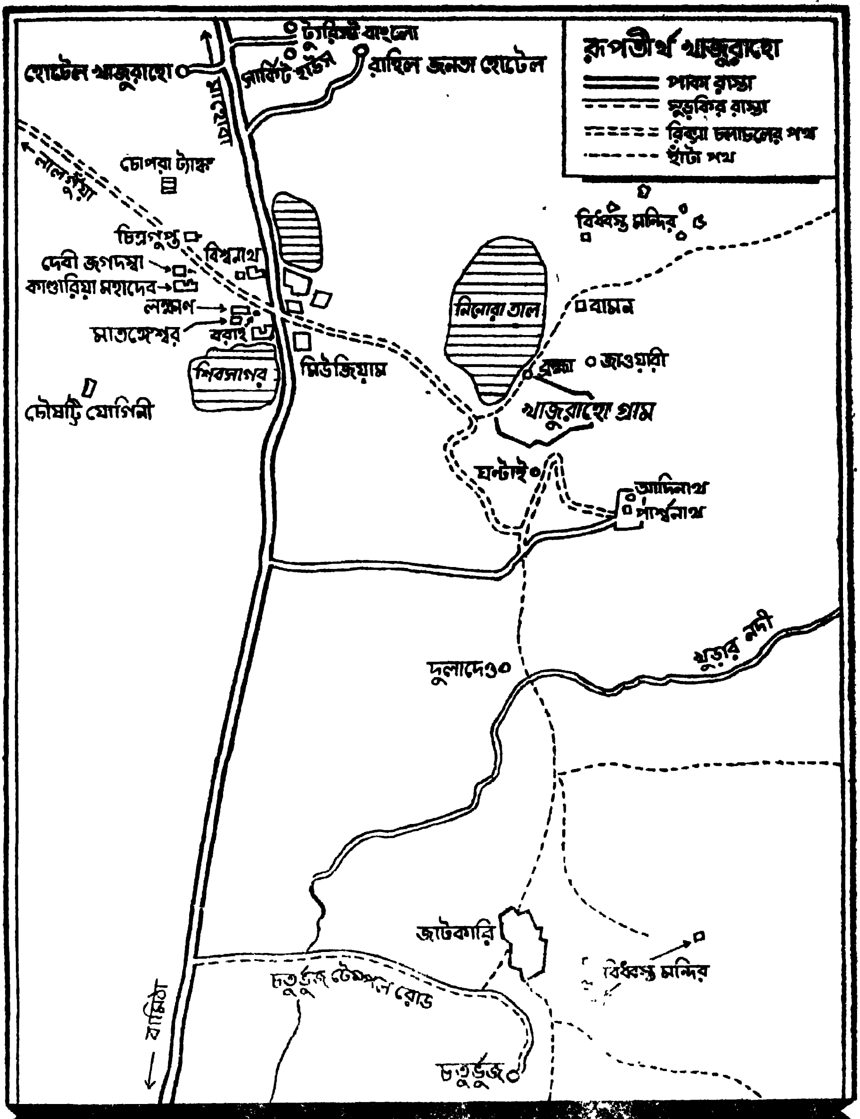
চরৈবেতি

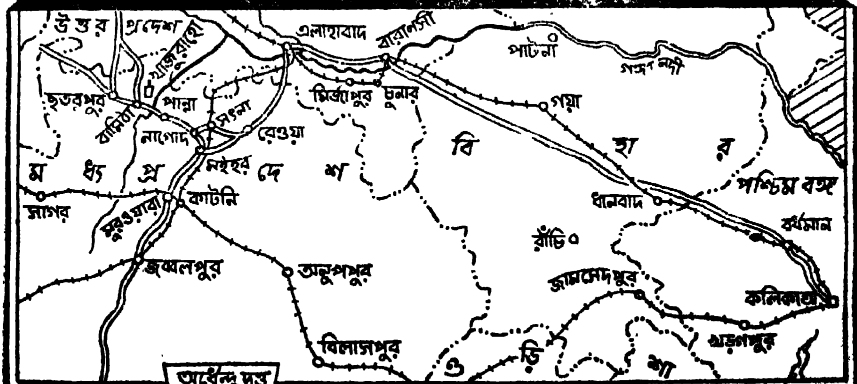
অমরাবতী-আসাম

মায়াময়-মেঘালয়

ও

গিরি-কান্তার ( রূপকুণ্ড )


রূপতীর্থ খাজুরাহো
পাকা রাস্তা
সুরকির রাস্তা
রিক্সা চলাচলের পথ
হাঁটা পথ
ট্যুরিস্ট বাংলো
সার্কিট হাউস
রাহিল জনতা হোটেল
হোটেল খাজুরাহো
মাহোবা
চোপরা ট্যাঙ্ক
চিত্রগুপ্ত
দেবী জগদম্বা
কাণ্ডারিয়া মহাদেব
লক্ষ্মণ
মাতঙ্গেশ্বর
বরাহ
বিশ্বনাথ
শিবসাগর
মিউজিয়াম
চৌষট্টি যোগিনী
নিনোরা তাল
বিধ্বস্ত মন্দির
বামন
ব্রহ্মা
জাভারী
খাজুরাহো গ্রাম
ঘণ্টাই
আদিনাথ
পার্শ্বনাথ
দুলাদেও
খুড়ার নদী
জাটকারি
বিধ্বস্ত মন্দির
চতুর্ভুজ টেম্পল রোড
চতুর্ভুজ
বামিঠা


উত্তর প্রদেশ
খাজুরাহো
এলাহাবাদ
বারাণসী
পাটনা
গঙ্গা নদী
ছতরপুর
বামিঠা
পান্না
সৎনা
নাগোদ
রেওয়া
মির্জাপুর
চুনার
গয়া
বি হা র
ম ধ্য প্র দে শ
মইহর
সাগর
মুড়ওয়ারা
কাটনি
ধানবাদ
পশ্চিম বঙ্গ
বর্ধমান
রাঁচি
জব্বলপুর
অনুপপুর
জামসেদপুর
কলিকাতা
খড়্গপুর
বিলাসপুর
ও ড়ি শা
অর্ধেন্দু দত্ত

আলোকচিত্র : শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার, শ্রীঅজিত গোস্বামী ও লেখক
মানচিত্র ও অন্যান্য স্কেচ্ শ্রীঅর্ধেন্দু দত্তের সৌজন্যে।

প্রচ্ছদ : সামনে—কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দির ও মন্দিরগাত্র
পেছনে—জগদম্বা ও চিত্রগুপ্ত মন্দির

## বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| আদিনাথ মন্দির | ৭৩ |
| আলাউদ্দিন খাঁসাহেব | ৯ |
| ইজরাইল | ৫৫ |
| কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দির | ৯৮ |
| খাজুরাহো | ৩৭, ৪৬ ও ১৩১ |
| খাজুরাহো (গ্রাম) | ৭৬ |
| খাজুরাহো দর্শনের সময় | ৪১ |
| খাজুরাহের ইতিহাস | ২৪, ২৮, ও ৩৪ |
| খাজুরাহের পথ | ২, ৭, ২৩, ও ৩২ |
| খাজুরাহের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য | ৩৪ |
| চতুর্ভুজ মন্দির | ৪৬ |
| চান্দেলা রাজবংশ | ২৮ ও ১৩০ |
| চান্দেলা রাজাদের ধর্মনিপরপেক্ষতা | ৭৩ |
| চিত্রগুপ্ত মন্দির | ১১১ |
| চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির | ১৩২ |
| জগদম্বা মন্দির | ১০৭ |
| জাওয়ারী মন্দির | ৭৭ |
| ট্যুরিস্ট্-বাংলো | ৩৯ |
| দুলাদেও মন্দির | ৬১ |
| নন্দী মন্দির | ১১৩ |
| পশ্চিম মন্দিরগোষ্ঠী (ওয়েস্টার্ন গ্রুপ) | ৩৮ ও |
| পান্না | ২৬ |
| পার্বতী মন্দির | ১১৩ |
| পার্শ্বনাথ মন্দির | ৬৯ |
| বরাহ অবতার | ৮৯ |
| বরাহ মন্দির | ৮৭ |
| বামন অবতার | ৭৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বামন মন্দির | ৮০ |
| বামিঠা | ৭ ও ৩৬ |
| বিশ্বনাথ মন্দির | ১১৩ |
| ব্রহ্মা মন্দির | ৭৬ |
| মাইহার | ৬ |
| মাতঙ্গেশ্বর মন্দির | ১২৫ |
| মিউজিয়াম (প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা) | ১২৭ |
| মিথুন-মূর্তি প্রসঙ্গে | ৬৬ |
| রাহিল জনতা হোটেল | ৪০ ও ১১৮ |
| লক্ষ্মণা মন্দির | ৯১ |
| লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দির | ১৩৩ |
| শান্তিনাথ মন্দির | ৬৯ |
| সাতনা | ২ |
| হেমবতীর উপাখ্যান | ১৩০ |


যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি—


Mulk Raj Anand & Ors. — 'Homage to Khajuraho.'

Vidya Prakash — 'Khajuraho'

Kanwar Lal — 'Immortal Khajuraho'

Eliky Zannas & Anr. — 'Khajuraho'

Urmila Agarwal — Khajuraho sculptures & their Significance'

O. C. Ganguli & Ors. — 'The Art of the Chandelas'

M. R. Acharekar — 'Khajuraho'

Krishna Deva — 'Khajuraho'

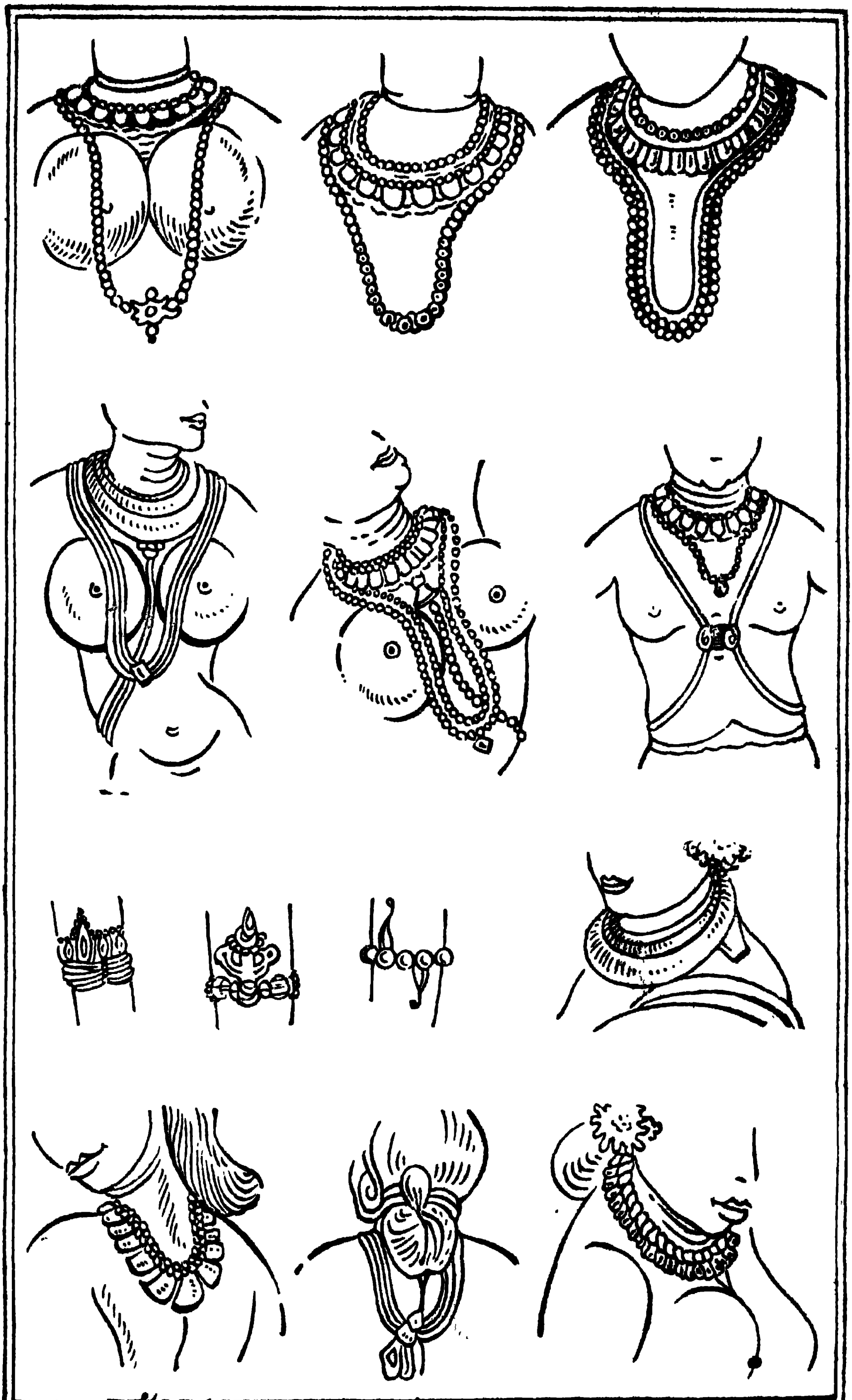
B. S. Nayal & Anr. — 'Khajuraho'

Encyclopaedia Britannica—1973 & Gazetteers etc.

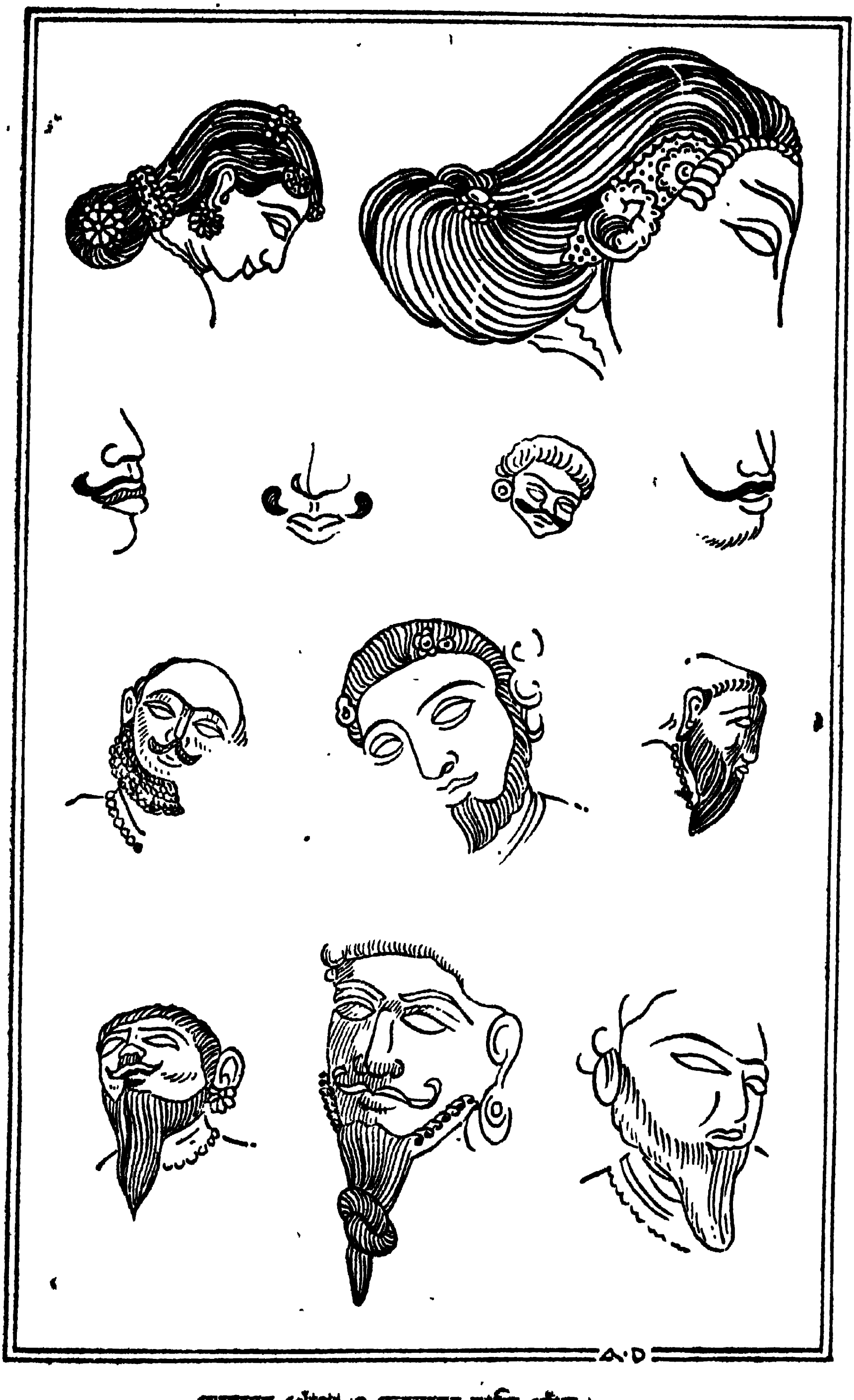
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — 'খাজুরাহো চন্দেলস্মৃতি'

নগেন্দ্রনাথ বসু — 'বিশ্বকোষ'

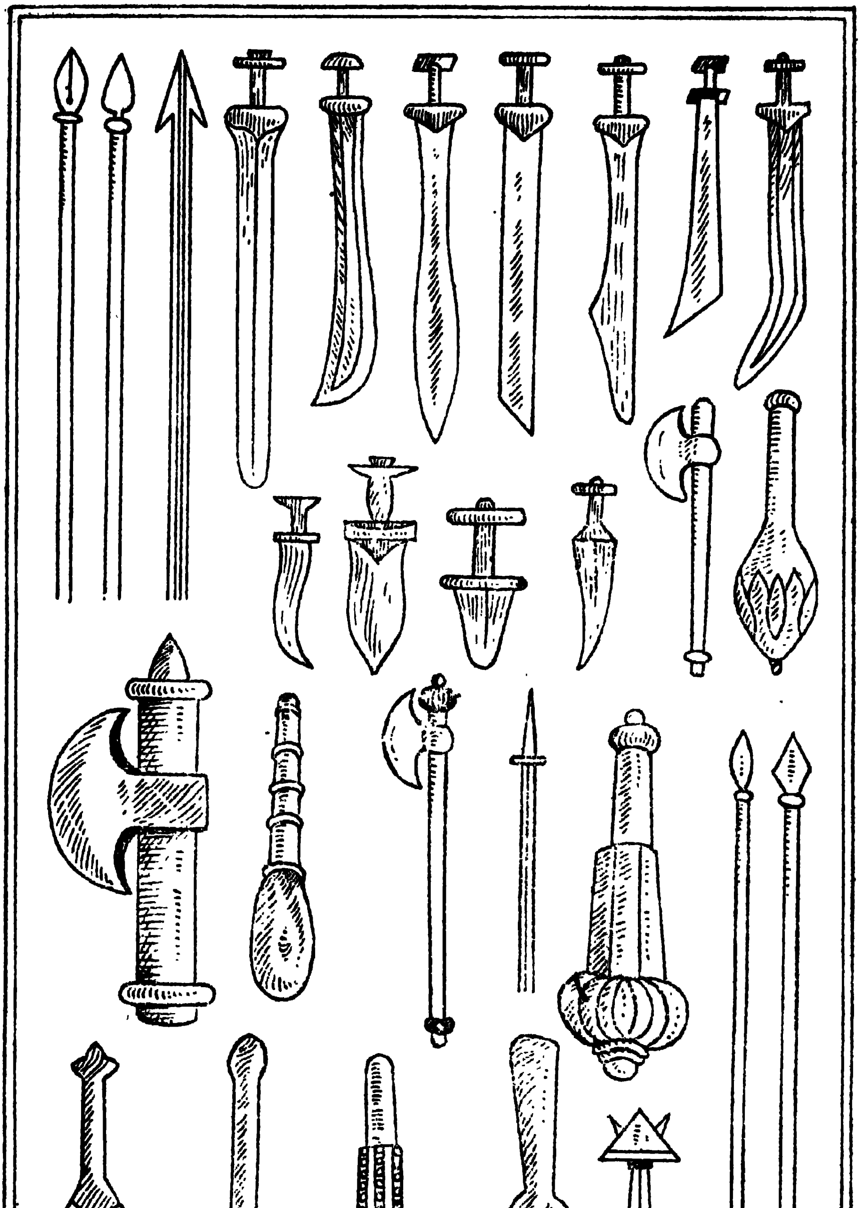
বোধিসত্ত্ব — 'ভারতের যাদুঘরে'



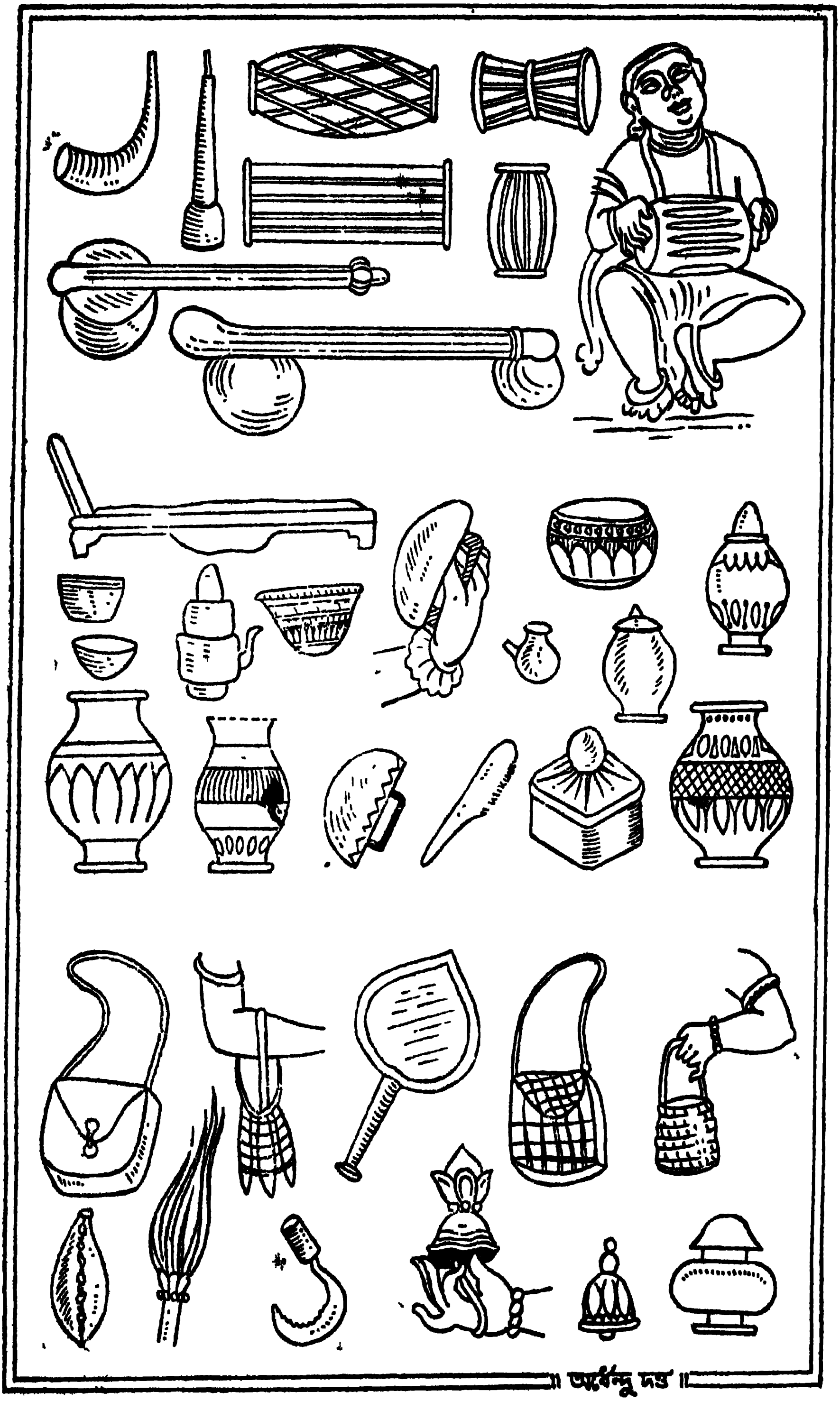

খাজুরাহোর মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবী ও নর-নারীর অলঙ্কার।



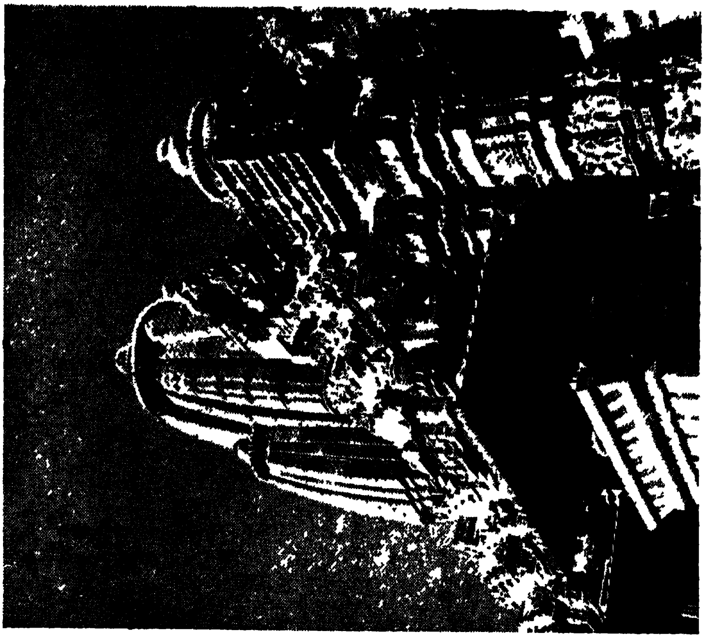
মেয়েদের খোঁপা ও ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ।



অস্ত্র-শস্ত্র



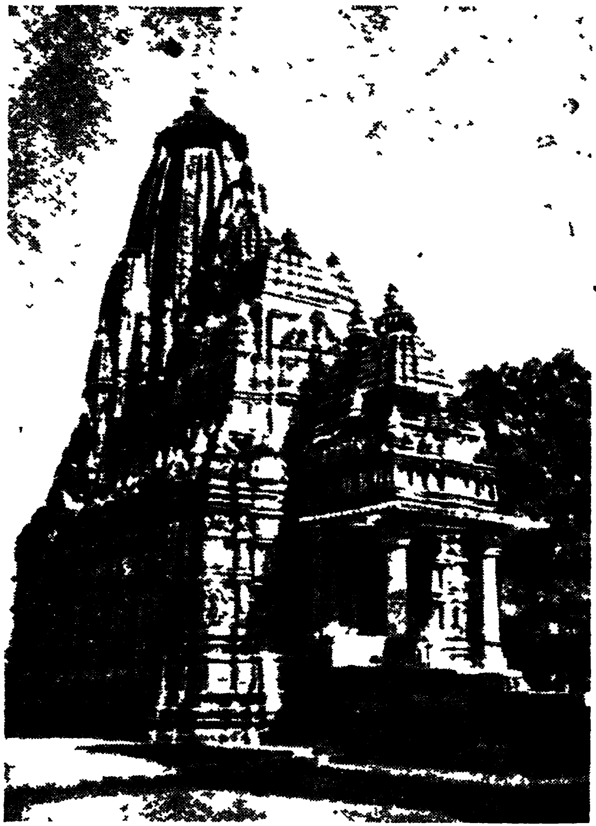

বাদ্যযন্ত্র, আসবাব ও বাসনপত্র, প্রসাধন সামগ্রী এবং বিবিধ দ্রব্য।

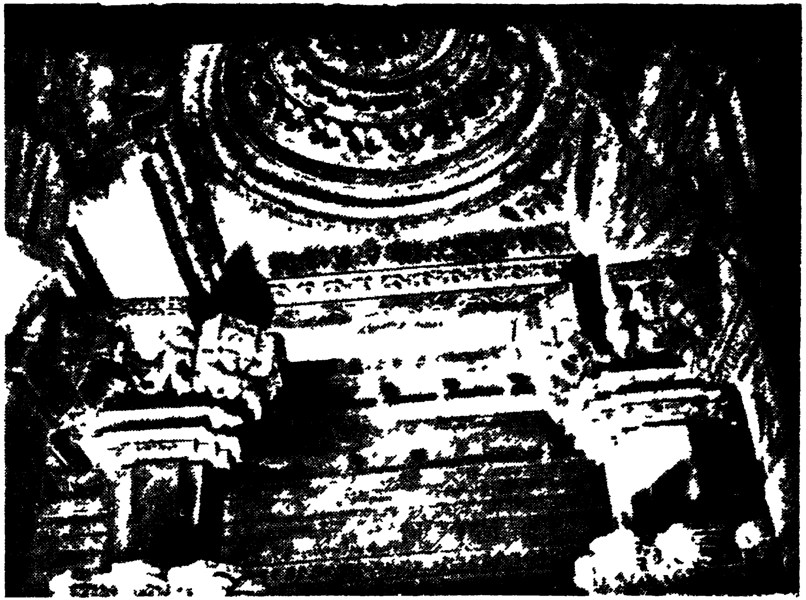


বিশ্বনাথ মন্দির



লক্ষ্মণ মন্দির





উপরে ঃ বামন মন্দিরে সিলিংএর কারুকার্য

পাশে ঃ পার্শ্বনাথ মন্দির

কোথায় চলেছি ?

হিমালয়ে নয়।

তীর্থ দর্শনে ?

না। তাও হয়তো নয়। যে মন্দিরে পূজোর পাট চুকে গিয়েছে, তাকে আর তীর্থ বলা যায় কি ?

বোধ হয় যায় না। তবু আমি আজ তীর্থে চলেছি। পুণ্যতীর্থ নয়, রূপতীর্থে। রূপতীর্থ খাজুরাহো।

তাজমহল ও দয়ালবাগ দেখেছি। পুরী ও কোনারক গিয়েছি। দর্শন করেছি অজন্তা-ইলোরা ও এ্যালিফান্টা এবং মানুষের আরও বহু বিচিত্র ও অপরূপ সৃষ্টি। কোন-কোনটি কয়েকবার করে দেখেছি।

কিন্তু কোথায়, তাদের কথা বলার জন্য কখনও তো কলম নিয়ে বসি নি! তাহলে আজ খাজুরাহের কথা লিখতে বসলায় কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার। শুধু বলতে পারি—মানুষের মহৎ সৃষ্টির এই বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় যে আমার সারা মন জুড়ে রয়েছে। চোখ বুজলেই সেই রূপতীর্থ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না তাকে। অতএব কলম নিয়ে বসতে হয়েছে।

আমি স্থপতি নই, ভাস্কর নই। চিত্রশিল্পী কিংবা আলোকচিত্রকর পর্যন্ত নই। তবু খাজুরাহের কথা লিখতেই হবে আমাকে। লিখতে হচ্ছে মনের তাগিদে, অন্তরের আহ্বানে। আর তাই নিজের অযোগ্যতার কথা বিস্মৃত হয়ে অবিস্মরণীয় রূপতীর্থের কথা লিখতে বসেছি আজ।

এইমাত্র আমাদের ট্রেন সাতনা পৌছল। কলকাতা থেকে খাজুরাহো যাবার সোজাপথ সাতনা হয়ে। হাওড়া-এলাহাবাদ-বম্বে মেল সাতনায় থামে। আমরা সেই গাড়িতেই এলাম। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হাওড়া থেকে গাড়ি ছেড়েছে। এখন বেলা দেড়টা। অর্থাৎ রেলযোগে এই ৯৯৩ কিলোমিটার পথ আসতে আঠারো ঘণ্টা সময় লাগল।

সাতনা স্টেশনটি বেশ বড় ও কর্মব্যস্ত। হবেই তো, সাতনা জেলাসদর। এখানে কয়েকটি সিমেন্টের কারখানা আছে। তার ওপরে প্রতিবেশী জেলা পান্নারও এটি রেলস্টেশন।

মালপত্র নিয়ে ওয়েটিংরুমে আসি। শীতকাল, স্নানের প্রয়োজন নেই। কেবল হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। তারপরেই বাস স্ট্যাণ্ডে রওনা হতে হবে।

সাতনা থেকে খাজুরাহো ১১৮ কিলোমিটার। বাসে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। ভাড়া ছ'টাকার মতো। আমরা আজই খাজুরাহো পৌছতে চাই।

আমরা মানে রণজিৎ, গৌতম ও সৌরীনবাবু। রণজিৎকুমার শীল ও গৌতম মুখোপাধ্যায় আমার দুই তরুণ সহকর্মী আর সৌরীন সেনগুপ্ত একজন প্রবীণ বন্ধু।

হাত-মুখ ধুয়ে ওয়েটিং-রুমে ফিরে আসি। বেলা দুটো, এখুনি খেয়ে নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে যাওয়া দরকার। নইলে আজ খাজুরাহো পৌছনো মুশকিল হবে। জবলপুর থেকে যে বাসটি সাড়ে তিনটে নাগাদ এখানে আসে, সেইটেই আজকের মতো সোজা খাজুরাহো যাবার শেষ বাস।

"আপলোগ কৌন সী গাড়ি সে আয়ে হ্যাঁয় ?"

কিট্-ব্যাগটা কাঁধে তুলতে গিয়ে বাধা পাই। পিছনে তাকাই। কোট-প্যাণ্ট্ পরা জনৈক স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকছেন। তিনিই প্রশ্ন করেছেন আমাদের।

উত্তর দিই।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, "আপলোগ কাঁহাসে আয়ে হ্যাঁয় ?"

"কলকাত্তা।"

তিনি কয়েক পা এগিয়ে আসেন আমার দিকে। পুনরায় প্রশ্ন করেন আমাকে, "আপ মে সে ঢাকুরিয়া কা কোই রহ্নেওয়ালা হ্যাঁয় ?"

সবিস্ময়ে উত্তর দিই, "জী হাঁ, ম্যাঁয় !"

আমার বিস্ময়ের পালা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক একেবারে কাছে এসে বিশুদ্ধ বাংলায় বলে ওঠেন, "আমার নাম অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আপনার ফণিকাকার ভাইপো।"

কাকাবাবুর (গজেন্দ্রকুমার মিত্র) বন্ধু ফণিকাকা বলেছিলেন বটে তাঁর এক ভাইপো এখানে ডাক্তারী করেন। বলেছিলেন—তিনি তাঁকে একখানি চিঠি লিখে দেবেন। ফণিকাকা তাঁর ভাইপোর ঠিকানাটাও দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা আজই খাজুরাহো চলে যাবো বলে আর তাঁর খোঁজ করবার কথা মনে হয় নি।

ডাক্তারবাবুকে কথাটা বলতেই তিনি সোচ্চার স্বরে প্রতিবাদ করে ওঠেন, "তা বললে তো চলবে না দাদা! ছোটকাকার চিঠি পাবার পর থেকেই যে আমরা আপনাদের পথ চেয়ে বসে আছি। একটা রাত গরীব ভাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকালের দিকে খাজুরাহো রওনা হবেন।"

এর পরে আর কি বলব? সুতরাং সম্মত হয়ে যাই। ডাক্তারবাবু নিজেই কুলি ডেকে আনেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে দুখানি রিক্সায় উঠে বসি। ডাক্তারবাবু তাঁর স্কুটারে আগে আগে চলেছেন।

কেবল রেলস্টেশন নয়, সাতনা শহরটিও কর্মব্যস্ত। ছোট শহর, তবে বেশ জমজমাট। স্টেশন থেকে খানিকটা পুবে এগিয়ে মূল-পথ—উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। উত্তরদিকে এগোলে বিড়লাদের বিখ্যাত এ. সি. সি. (সিমেণ্ট) কারখানা। এই কারখানাটি সাতনার প্রধান কর্মকেন্দ্র। কিন্তু আমরা উল্টোদিকের পথ ধরেছি—দক্ষিণদিকে চলেছি। ডাক্তারবাবুর পাড়ার নাম কামতাটোলা। সেটি দক্ষিণে।

মূল-পথটি নাতিপ্রশস্ত। কিন্তু পথের পাশে প্রচুর ঝকঝকে দোকানপাট। মাঝে-মাঝেই এক একটি চৌক্ বা চৌমাথার মোড়। প্রতি পথের ওপরেই নাকি এমন চৌক্ আছে। যেমন—বিহারী, লালতা, হনুমান, ডালিবাবা, গৌশালা, সিমরিয়া ও পান্নিলাল প্রভৃতি চৌক্।

স্টেশন থেকে আধমাইলের মতো এসে পথের ডানদিকে কোতয়ালী। তারই পাশ দিয়ে রেললাইন পেরিয়ে একটি পথ পশ্চিমে প্রেমনগর চলে গিয়েছে। সেখানে একটা সিমেণ্ট কারখানা, কিছু সরকারী কোয়ার্টার্স এবং দুটি স্কুল ও একটি কলেজ আছে। সাতনায় তিনটি কলেজ ও বেশ কয়েকটি হাইস্কুল রয়েছে

আমরা মূল-পথ ধরে দক্ষিণে এগিয়ে চলেছি। শুধু দোকানপাট নয়, পথের পাশে মাঝে মাঝে বড় বড় বাড়ি। দুয়েকটি বাড়ি তো প্রায় প্রাসাদতুল্য। এ-অঞ্চলে সাতনা বেশ বড় শহর। আয়তন ৩৬·২৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৭১ সালের গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ৫৭,৫৩১ জন, তাঁদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ২৫,৭২৭ জন। ৮,১৫৬টি বাড়ি ছিল এ শহরে। এইসব বাড়িতে ১৩,০১৯টি পরিবার বাস করতেন। এখন বাড়ি ও জনসংখ্যা আরও বেড়েছে।

ডাক্তারবাবু স্কুটারে আগে আগে চলেছেন। আমাদের রিক্সা পেছনে। মনে মনে ডাক্তারবাবুর কথাই ভেবে চলেছি। ফণিকাকা একদিন কথায় কথায় তাঁদের কিছু পারিবারিক ইতিহাস বলেছিলেন আমাকে।

ডাক্তারবাবুদের আদিনিবাস শিলাইদহ ইউনিয়ান বোর্ডের ( কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ) মির্জাপুর গ্রামে। তাঁদের বাস্তুভিটায় শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং ডাক্তারবাবুর শৈশবে ফণিকাকা তাঁকে নিয়ে একবার রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ও পদ্মা দেখিয়ে এনেছিলেন।

ডাক্তারবাবুর বাবা ৺যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে ১৯২৩ সাল নাগাদ সাতনায় আসেন। তখন সাতনা রেওয়া দেশীয় রাজ্যের একটি নিতান্তই নগণ্য তহশিল। দরিদ্র অধিবাসীরা ডগদারসাবকে সামান্যই পারিশ্রমিক দিতে পারতেন। তাই দিয়েই সংসার প্রতিপালন করতেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি ডাক্তারীকে ব্যবসা বলে বিবেচনা না করে সেবাধর্ম রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। আজীবন তিনি সেই ধর্ম পালন করে গিয়েছেন।

একদিকে যতীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন মানবসেবক, আরেকদিকে তেমনি ছিলেন সুচিকিৎসক। তাই মাইহার রেওয়া ও পান্নার রাজবাড়িতে প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ত। একদিন মাইহার রাজবাড়িতেই সুরসম্রাট আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মাইহারের মহারাজা খাঁ-সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

কিন্তু খাঁ-সাহেবের কথা এখন থাক। যতীন্দ্রনাথের কথাই ভাবা যাক। যতীন্দ্রনাথও খাঁ-সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছে সেতার ও বেহালা বাজানো শিক্ষা করেন। তখন তিমিরবরণ ভট্টাচার্য মাইহারে সুরসাধনায় রত ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের চার ছেলে—সনৎকুমার, রঞ্জিতকুমার, অজিতকুমার ও অসিতকুমার। চারজনেই খাঁ-সাহেবের কাছে যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। সনৎবাবু ও রণজিৎবাবু দুজনেই সঙ্গীতের অধ্যাপক এবং রেওয়াতে থাকেন। সনৎবাবু

ট্রিপ্‌ল এম. এ., এম. মিউজ, এল-এল. বি., ও পি. এইচ, ডি.। ছোটভাই অসিতবাবু ভূপালে একটা কলেজে লেকচারার আর সেজভাই অজিতবাবু ডাক্তারী পাস করে পিতার আদর্শ পালন করে চলেছেন।

গোশালা চৌক্ ছাড়িয়ে সামান্য এগিয়েই বড় রাস্তার ওপরে ডাক্তারবাবুর বাড়ি। দোতলা বাড়ি। নিচেরতলা আরেকজন ডাক্তারকে ভাড়া দিয়েছেন। দোতলায় নিজেরা থাকেন।

রিক্সাভাড়াটাও ডাক্তারবাবু দিতে দেন না আমাদের। আমরা যে সাতনায় এসেছি, আমরা তাঁর অতিথি। দু-পুরুষ ধরে তাঁরা সাতনায় বসবাস করছেন। অতএব রিক্সাওয়ালারা তাঁর অবাধ্য হয় না।

দু-তলায় উঠে আসতেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বিভাদেবী ও ছেলে-মেয়েরা আমাদের সহাস্যে স্বাগত জানায়। বিভাদেবী শুধু সুগৃহিণী নন, তিনিও মাইহারে সঙ্গীতশিক্ষা করেছেন। ভদ্রমহিলার সহৃদয় ও আন্তরিক ব্যবহার ভাল লাগে আমাদের।

ডাক্তারবাবুর একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। ছেলে বড়। ডাকনাম বাবু, ভাল নাম জ্ঞানগোপাল। ক্লাস নাইনে পড়ে।

বড় মেয়ের বুলুর ভাল নাম মল্লিকা। সে ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী। ছোট মেয়ে পুনু এখনও স্কুলে ভর্তি হয় নি। তবে তার বইয়ের বাক্সটি দিদির থেকে ছোট তো নয়ই, বরং একটু বড়। সে নিজেই তার ভাল নাম জানিয়ে দিল আমাদের— তুলিকা। সেই সঙ্গে জানায়—"আগলে সাল ম্যাঁয় ভি স্কুল যাউঙ্গী!"

ওরা বাংলা বলতে পারে, তবে হিন্দী বলতেই সুবিধা পায় বেশি। খুবই স্বাভাবিক।

আমরা আসব বলে আজ বাবু ও বুলু স্কুলে যায় নি। ওরা আমাদের চিনত না, তবু আমরা কলকাতা থেকে আসছি, সুতরাং সারাদিন আমাদের পথ চেয়ে বসেছিল। এতক্ষণে ওদের সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। আর তাই ওদের আনন্দ আর ধরছে না। পুনু তো রীতিমত চিৎকার করে হিন্দীতে পাশের বাড়ির 'আন্টি'কে জানিয়ে দিল যে, তার জেঠু ও কাকারা এসে-গিয়েছে। রণজিৎকে পেয়েই সে সবচেয়ে খুশি। ঐ নামে যে তার একজন জ্যাঠা আছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা অপরিচয়ের সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। ভ্রমণপথের বিকেলটি বড়ই আনন্দময় হয়ে উঠল।

খাওয়া তো নয়, রীতিমত নেমন্তন্ন। খাবার পরে সবাই সামনের বারান্দায়

এসে বসি। বৌমার রান্নার তারিফ দিয়ে বৈঠক শুরু হয়। একসময় আমরা মাইহারের আলোচনায় চলে আসি। মাইহার সাতনা-জবলপুর রেল ও বাস-পথের ওপরে অবস্থিত। রেলপথের দূরত্ব মাত্র ৩৬ কিলোমিটার। বম্বে মেল মাইহারে থামে না। তা হলেও সাতনা থেকে মাইহার যাতায়াতের ট্রেন আছে। আধঘণ্টার মতো সময় লাগে। বাসে যেতে কিন্তু প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে যায়। তবে সারাদিন বাস চলে।

মাইহার একসময় রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারপরে পান্নার রাজা মাইহার অধিকার করেন। পরে তিনি ঠাকুর দুর্জন সিংহের পিতাকে এই তহশিলটি উপহার দেন। দুর্জন সিংহের পুত্র বিষ্ণু সিংহের পৌত্র রঘুবীর সিংহ রেল লাইন নির্মাণের জন্য ইংরেজ সরকারকে জমি দান করেন। প্রতিদানে ইংরেজরা ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে তাঁকে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি ও ন'টি তোপ দান করেন।

সেই সামন্তরাজ্য এবং তার রাজধানী দুইয়ের নামই মাইহার। ২৪°১৬' উঃ অক্ষরেখা ও ৮০°৪৮' পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর। মাইহার উত্তর-ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে যাবার প্রধান পথের ওপরে অবস্থিত। সেখানে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে নির্মিত একটি দুর্গ আছে। রাজারা ঐ দুর্গের ভেতরই বাস করতেন। শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বে দুটি মনোরম সরোবর রয়েছে।

মাইহার পবিত্র তীর্থও বটে। বাস স্ট্যাণ্ড ও রেল স্টেশনের অনতিদূরে সারদাদেবীর মন্দির। মাইহারের সারদামায়ী মধ্যভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়া ও জাগ্রতা দেবী।

আগেই বলেছি আরও একটি কারণে মাইহার মহাতীর্থ। প্রাতঃস্মরণীয় সুরস্রষ্টা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেবের সাধনভূমি মাইহার। সারদামায়ীর দর্শনার্থীরা প্রায় প্রত্যেকেই ফেরার পথে খাঁ-সাহেবকেও দর্শন করে যেতেন। অথচ তাঁদের অনেকেই তাঁর সুরসাধনার সংবাদ রাখতেন না। শুধু জানতেন তিনি একজন মহাত্মা। মহাত্মা তো বটেই। মহর্ষিও বলা যেতে পারে।

দুর্ভাগ্যের কথা আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেবের সেই সাধনপীঠ 'মদিনা ভবন' আজ প্রায় পরিত্যক্ত। কেউ সেখানে থাকেন না। যে-বাড়িতে আলী আকবর ও অন্নপূর্ণা জন্মেছেন, যে-বাড়িতে তিমিরবরণ, রবিশঙ্কর, পান্নালাল ঘোষ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সুরশিক্ষা করেছেন, যে-বাড়ি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের

পদধ্বনিতে প্রতিনিয়ত অনুরণিত হয়েছে, সেই বাড়ি আজও মিউজিয়ামের মর্যাদা পেল না। এর চেয়ে জাতির আর কি বড় কলঙ্ক হতে পারে?

কথায় কথায় খাজুরাহের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ডাক্তারবাবু ও বৌমা দুজনেই খাজুরাহো গিয়েছেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি তিনবার খাজুরাহো গিয়েছি। প্রথমবার ১৯৪১ সালে।"

"তখন খাজুরাহো কেমন ছিল?" প্রশ্ন করি।

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, "তখন আমি বাবুর মতো, ক্লাস নাইনে পড়ি। তবে তখনও খাজুরাহো সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না সাতনার মানুষদের। তাই বাবা আমাকে যেতে নিষেধ করেন নি। গিয়ে বুঝেছি, ওটা খাজুরাহো যাবার বয়স নয়।

"যাক্ গে যে কথা বলছিলাম—স্কুলের কয়েকটি সহপাঠী ছিল সেবারে আমার সঙ্গী। আমরা সাতনা থেকে ছতরপুরের প্রথম বাস ধরে বেলা দশটা নাগাদ বামিঠায় পৌঁছলাম। আপনি জানেন, সাতনা-ছতরপুর রাস্তায় বামিঠা একটি থানা-সদর। ওখান থেকেই খাজুরাহের রাস্তা বেরিয়েছে, দূরত্ব ১১ কিলোমিটার।"

আমি মাথা নাড়ি। ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, "সাতনা থেকে বামিঠার দূরত্ব ১০৫ কিলোমিটার। বামিঠা ও খাজুরাহো ছতরপুর জেলায়। পান্না ও ছতরপুর পথের ঠিক মাঝখানে বামিঠা, দুটি জেলা-সদর থেকেই দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার।

"তখন বামিঠা থেকে খাজুরাহের পথটি ছিল কাঁচা, মাটির বনপথ। কোন রকমে গরুরগাড়ি যেতে পারত। আমরা পায়ে হেঁটেই সেই নির্জনপথ পাড়ি দিয়েছিলাম।"

"পথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না?" গৌতম প্রশ্ন করে।

"না।" ডাক্তারবাবু উত্তর দেন। "তখনও এসব অঞ্চলে দেশীয় রাজ্যের প্রভাব রয়ে গিয়েছে।"

"দেশীয় রাজাদের আমলে বুঝি চুরি-ডাকাতি ছিল না?"

"না, না। থাকবে কেমন করে? চোর ধরা না পড়লে স্থানীয় পুলিস অফিসারের চাকরি যেত আর ধরা পড়লে চোরের হাত-পা কেটে দেওয়া হত।"

"তখন এসব অঞ্চল কোন রাজ্যে ছিল?" এবারে রণজিৎ প্রশ্ন করে।

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, "গাতনা ছিল রেওয়া রাজ্যে, পান্না ছিল আলাদা রাজ্য আর...

"বামিঠা ও খাজুরাহো ছিল ছত্তরপুরে।" গৌতম যোগ করে।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়েন। তারপরে বলতে থাকেন, "সেবারে দুপুরের একটু পরে আমরা খাজুরাহে পৌঁচেছিলাম। তখন পশ্চিমদিকের সব মন্দির জঙ্গলে ঘেরা। তবে জৈন মন্দিরগুলি মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। পার্শ্বনাথ মন্দিরের কাছেই কেবল কয়েকটি দোকান ছিল, হয়তো জায়গাটা খাজুরাহো গ্রামের পাশে বলেই। এখন যেখানে বাস স্ট্যাণ্ড ও বাজার, সেখানে তখন কোন বাড়ি-ঘর কিংবা দোকানপাট ছিল না। স্থানীয় লোকেরাও বড় একটা ওদিকে যেতেন না।"

"তার মানে আপনারা জঙ্গল ভেঙে একা একা পশ্চিমদিকের অর্থাৎ মূল মন্দিরগুলি দর্শন করলেন?" জিজ্ঞেস করি।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে জবাব দেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। জঙ্গলা-পথে মন্দিরগুলো পরিক্রমা করে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম বামিঠা। বিকেলের বাসটাও পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"তারপরে আপনি আবার কবে খাজুরাহে গিয়েছেন?" রণজিৎ জিজ্ঞেস করে।

ডাক্তারবাবু বলেন, "অনেক পরে, ১৯৬২ সালে।"

"তখন খাজুরাহো কি রকম ছিল?" প্রশ্ন করি।

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, "সেবারে আর হাঁটতে হয় নি। বাসে করেই খাজুরাহো পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম। তবে তখনও বর্তমান বাস স্ট্যাণ্ড হয় নি। কেবল মিউজিয়াম তৈরি শুরু হয়েছে। বাস থামত সেই জৈন মন্দিরের সামনে। পশ্চিমদিকের মন্দিরগুলোর চারিদিকে তখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা সেবারে বেশ ভালভাবে দর্শন করে খাজুরাহের অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছিলাম।"

"সেবারে বৌদি সঙ্গে ছিলেন?"

রণজিতের প্রশ্নে সবাই হেসে উঠি। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বৌমা বলেন, "আমি ওর সঙ্গে যাবো কেমন করে, তখনও যে আমাদের বিয়েই হয় নি।"

"আপনি খাজুরাহো যান নি?" এবারে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

"গিয়েছি।" বৌমা বলেন, "আপনার দাদার সঙ্গে আমি খাজুরাহো দর্শন করেছি।"

"তখন খাজুরাহো কেমন ছিল ?" গৌরীনবাবু প্রশ্ন করেন।

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, "তখন বাস স্ট্যাণ্ড, বাজার, মিউজিয়াম ও ট্যুরিস্ট-বাংলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমদিকের মন্দির-সংলগ্ন পার্ক বাগান ও রাস্তা তৈরি শুরু হয়েছে। এক কথায় তখন পূর্ণ উদ্যমে খাজুরাহের উন্নয়ন চলেছে।"

অর্থাৎ তখন আপনারা আধুনিক খাজুরাহের প্রাথমিক রূপ দেখে এসেছেন ?"

ডাক্তারবাবু ও বৌমা মাথা নাড়েন।

রাত সওয়া-বারোটা। কাল সকালে উঠতে হবে। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসর ভাঙে। আমরা এসে শুয়ে পড়ি। চোখ বুজি।

না। ঘুম আসছে না আমার চোখে। চোখ বুজলেই মনের মুকুরে ভেসে উঠছে সেই মানুষটির মুখখানি—যে-মুখে সর্বদা লেগে থাকত শিশুর সরল হাসি, কিন্তু চোখে তপস্বীর গভীরতা। যিনি সামান্য কারণে কেঁদে ভাসাতেন কিন্তু শিষ্যদের সামান্যতম ত্রুটিও ক্ষমা করতেন না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিক্ষক সেই আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব আজ আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। আমি তাঁরই কথা ভেবে চলেছি। জানি এ ভাবনার শেষ নেই, তবু না ভেবে পারছি না। আমি যে পুণ্যতীর্থ মাইহারের অতি নিকটে রাত্রিবাস করছি, আমি যে আজ তাঁরই একজন শিষ্যের অতিথি।

ভেবে চলি তাঁর মহাজীবনের কথা—যে-জীবন শুধু তপস্যাসিদ্ধ নয়, বিস্ময়করও বটে। ত্রিপুরার এক গণ্ডগ্রাম শিবতলী। সফদর হুসেন খাঁ বা সদু খাঁ নামে জনৈক মধ্যবিত্ত মুসলমান বাস করতেন সেখানে। তাঁর ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ, নাম দীননাথ দেবশর্মা। পত্নী-বিয়োগের পরে দীননাথ তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বাংলা থেকে কুকীদের দেশে চলে এলেন। সেখানে তিনি এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৭৭৬ সাল। শুরু হয়েছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। দীননাথের পুত্র ততদিনে শক্তসমর্থ একজন যুবক সন্ন্যাসী এবং কুকীদের সর্দার। তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগ দিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হলেন। জনৈক

ধর্মপ্রাণ ফকির তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। ফকিরের দাওয়াই ও তাঁর তরুণী কন্যা নয়তনের সেবা ও যত্নে সুস্থ হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী।

অবশেষে সন্ন্যাসী সংসারী হলেন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণদায়িনী নয়তনকে বিয়ে করলেন। নূতন নাম হল সীরাজুদ্দিন খাঁ। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সীরাজু ডাকাত—ধনীর শত্রু আর দরিদ্রের বন্ধু।

সীরাজুর চতুর্থ পুরুষ সদুখা। তিনি অতিশয় সঙ্গীত সুরসিক ছিলেন। তাঁর পাঁচ ছেলে। আলাউদ্দিন তৃতীয়। ডাকনাম আলম। তখন তার বয়স আট বছর।

হঠাৎ একদিন মায়ের কানে কথাটা এসে পৌছল—আলম পাঠশালায় না গিয়ে বুড়োশিবতলায় বসে সন্ন্যাসীদের গান শোনে। একে তো স্বামী ও মেজো ছেলের গান-বাজনায় তিনি অস্থির, তার ওপরে সন্ন্যাসী মানেই তো ডাকাত। তাই সেদিন আলম ঘরে ফিরতেই তিনি তার হাত-পা বেঁধে ঢেঁকিঘরে আটকে রাখলেন।

দিদির সহায়তায় আলম একসময় ছাড়া পেলো, কিন্তু ততক্ষণে তার মন ঘরের প্রতি বিষিয়ে উঠেছে—যেখানে গান-বাজনা নেই, সেখানে থেকে কি হবে?

অতএব সেদিন সন্ধ্যাতেই মায়ের কলসী থেকে বারোটি টাকা চুরি করে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। অচেনা ও অন্ধকার পথ তবু আট বছরের আলম চলল এগিয়ে। ভয়াবহ ও দুর্গম বনপথ পেরিয়ে পৌছল শ্যামগঞ্জের লঞ্চঘাটে। কিছু না জেনেই লঞ্চে উঠে বসল, সকালে নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ ও রেলে শেয়ালদা। সেই তার প্রথম লঞ্চ, স্টীমার ও রেলে চড়া এবং প্রথম শহর দেখা।

টাকা কয়টি চুরি গিয়েছিল পরদিনই গঙ্গার ঘাটে। দু'দিন না খেয়ে থাকতে হল। তারপরে খাবার জুটল রাজেন মল্লিকের বাড়িতে—কাঙালী ভোজনে।

একবেলা কাঙালী ভোজন, আরেকবেলা কর্পোরেশনের জল পান ও রাতে ফুটপাতে শয়ন করে কাটল কিছুদিন। তারপরে একদিন লুকিয়ে বাজনা শুনতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল কেদারনাথ ডাক্তারের বাড়িতে। সব কথা শুনে ডাক্তারবাবুর স্নেহশীলা স্ত্রী তাকে আশ্রয় দিলেন। একদিন ডাক্তারবাবু তাকে নিয়ে গেলেন পাথুরেঘাটায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে। তাঁর অনুরোধে গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল) তাকে গান শেখাতে রাজী হলেন।

কিন্তু শেখালেন না কিছুই। গুরুর সঙ্গে শুধু তানপুরা বাজিয়েই কেটে গেল

চার বছর। অবশেষে আলম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। গুরু তাকে গান শেখাতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজনা। এবং শেখাবার সময় গুরু সবিস্ময়ে টের পেলেন, শুধু শুনে শুনেই আলম তাঁর বহু গান শিখে ফেলেছে।

কাটল আরও তিন বছর। তারপরে একদিন অতর্কিতে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে নুলো গোপাল মারা গেলেন।

প্রথম গুরুবিয়োগের ব্যথা একটু কমতেই আলম আবার গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের খুড়তুতো ভাই অমৃতলাল দত্ত (হাবু) ছিলেন তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ল্যারিওনেট বাদক। রামপুরের নবাব একবার তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর দরবারের ওস্তাদ মিঞা তানসেনের বংশধর (মেয়ের দিকের) ওয়াজীর খাঁর সঙ্গে তাঁকে একবাড়িতে রেখেছিলেন কিছুদিন।

হাবু দত্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই শিমলার দত্তবাড়িতে গান-বাজনার আসর বসাতেন। একদিন আলম আসর ভাঙার পরে তাঁর পা ধরে বলে বসল—মুই আপনার পায়ের তলায় পইড়া থাকুম।

তার আগ্রহ দেখে হাবু দত্ত তাকে বাজনা শেখাতে রাজী হলেন। কিছুদিন শেখাবার পরে একদিন তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের মিনার্ভা থিয়েটারে আলমকে এক টাকা মাইনেয় তবলা বাদকের কাজ যোগাড় করে দিলেন।

গিরিশবাবু তার বাজনা শুনে খুশি হলেন। কিন্তু বললেন—আলাউদ্দিন নাম এখানে চলবে না। আজ থেকে তোর নাম প্রসন্ন বিশ্বাস।···সব সময় মনে রাখিস তুই আছিস সব ওঁচাটে বজ্জাতদের মধ্যে। হাঁসের মতো জলে থাকবি, কিন্তু সাবধান তোর গায়ে যেন জল না লাগে।

থিয়েটারে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আলম ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাণ্ডমাস্টার লবো সাহেবের কাছে বেহালা ও ব্যাণ্ড বাজানো শিখল, সানাই শিখল হাজারী ওস্তাদদের কাছে। আর তারপরেই মনে হল নিজের একটা বেহালা থাকা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়?

গানের জন্য যে আট বছর বয়সে বাড়ি পালিয়েছিলো, বেহালার জন্য সে নয় বছর পরে ঘরে ফিরে এলো। হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে মা হেসে-কেঁদে অস্থির হলেন। বাড়িতে কয়েকদিন খুশির জোয়ার বয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই সকলে তার উদাসীনতায় বিচলিত হলেন। ভাবলেন বিয়ে দিলে সব রোগ সেরে যাবে। মেয়ে ঠিক করাই ছিল—বাবার বন্ধু বসিরচাচার এগারো বছরের মেয়ে মদনমঞ্জরী।

মহা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। গভীর রাতে বর-কনে বাসরঘরে এলো। একটু বাদেই কিশোরী কনে পড়ল ঘুমিয়ে। তার শিয়রে রঙিন কাপড়ে পুঁটুলি বাঁধা বিয়েতে পাওয়া যৌতুকের কয়েকটি টাকা। বর উঠে বসল। চাঁদের আলোয় নববধূর কচি-কোমল মুখখানি দেখল একবার। একটু মায়া হল। তবু সে নিরুপায়। তাকে গান-বাজনা শিখতে হবে, তার একটা বেহালা চাই।

আস্তে আস্তে আলম নববধূর বালিশের তলা থেকে পুঁটুলিটা বের করল। নিঃশব্দে বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শ্রান্ত বিয়েবাড়ি তখন পড়েছে ঘুমিয়ে। আলম আবার বাড়ি থেকে পালালো। চললো কলকাতা।

বলা তো যায় না, চোরগুলো যদি গতবারের মতো আবার তার টাকা চুরি করে নেয়? আলম তাই শেয়ালদা থেকে সোজা চলে এলো চিৎপুরে—বাজনার দোকানে। কিনল বেহালা।

কম তো নয়, প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল বউ-য়ের পুঁটুলিতে। তাই বেহালা কেনার পরেও কিছু টাকা রয়ে গেল। আর টাকা যখন রয়েছে, তখন একটা ক্ল্যারিওনেট কিনে ফেলাই ভাল। ক্ল্যারিওনেট কেনার পরে খেয়াল হল কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি এবং তখন আর তার কাছে একটি পয়সাও নেই। অতএব আবার লঙ্গরখানা।

দুপুরে লঙ্গরখানা, বিকেলে কলের জল, সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে বসে বেহালা ও ক্ল্যারিওনেট বাজানো আর গভীর রাতে অকল্যাণ্ড হাউসের বারান্দায় এসে ঘুমিয়ে পড়া—আলমের জীবন চলল বয়ে।

কিন্তু এ-জীবন যে সাধকের জীবন নয়। কেবল কষ্ট করলেই তো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তার জন্য গুরু চাই। অতএব আবার গুরু অন্বেষণ। কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ। সেখান থেকে দশ মাইল হেঁটে মুক্তাগাছায় মহারাজা জগৎকিশোরের বাড়ি।

সঙ্গীতসুরসিক মহারাজা তাঁর বাজনা শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর অনুরোধে সভাগায়ক রামপুরের ওস্তাদ আহম্মদ আলি খাঁ তাঁকে শেখাতে রাজী হলেন। কিন্তু নিজের থেকে শেখালেন না কিছুই। দিবারাত্র গুরুসেবা করেই ব্যস্ত থাকতে হল আলমকে।

তবু সে গুরুর সঙ্গে রামপুর এলো। মহারাজার কাছ থেকে পাওয়া হাত-খরচের টাকা তুলে দিল গুরুর হাতে। তার সেই গুরুদক্ষিণা দিয়ে আহম্মদ আলি ইট কাটালেন। আলম মাথায় করে সেই ইট বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলো।

তবু গুরু তার হাতে সরোদ তুলে দিলেন না। কেন তিনি তাঁর নিজের ঘরাণা দেবেন এই ভেতো বাঙালীকে? তাই গুরু যখন ছেলেদের সরোদ শেখায়, আলম তখন গরু-মোষের খাবার ঠিক করে।

কিন্তু ঘরাণা বাঁচাতে পারলেন না আহম্মদ আলি খাঁ। একদিন তিনি টের পেলেন, শুধু শুনে শুনেই আলম তাঁর সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছে। তিনি তাকে 'ডাকাত ও লুটেরা' বলে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে।

রামপুরের পথে একদিন চলতে চলতে আলম হঠাৎ তানসেনের বংশধর ওয়াজীর খাঁর দর্শন পেয়ে গেল। তার মনে হল—একেই তো আমি খুঁজছি এতকাল ধরে। বলা বাহুল্য ওস্তাদজী আলমের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তবু আলম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে ভাবল—একবার যখন দেখা পেয়েছি, উপায় একটা হবেই হবে।

তারপরে এক আকস্মিক ঘটনার ভেতর দিয়ে আলম রামপুর সেনা-ব্যারাকের সান্ধ্য-ক্লাবের ব্যাণ্ড মাস্টারের চাকরি পেয়ে গেল। মাসিক মাইনে বারো টাকা।

কেটে গেল বেশ কিছুদিন। কিন্তু ওয়াজীর খাঁর কাছে পৌঁছবার কোন সুযোগই এলো না। অগত্যা মরীয়া হয়ে তাকে চতুরতার আশ্রয় নিতে হল। দু-ভরি আফিং কিনে মসজিদে গেল। ইমাম সাহেবকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে নবাবের কাছে একখানি চিঠি আদায় করল।

সঙ্গীতজ্ঞ নবাব হামেদ আলি খাঁ তার পরীক্ষা নিয়ে খুশি হলেন। ওয়াজীর খাঁর ডাক পড়ল নবাব দরবারে। তিনি আলমের সরোদ শুনে বিস্মিত হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আলমকে সরোদের তালিম দিতে সম্মত হলেন।

পরদিন প্রাসাদে নাড়া বাঁধার অনুষ্ঠান হল। নবাব নিজে মিঠাই পরিবেশন করলেন। আলমের হাতে নাড়া বেঁধে দিয়ে ওয়াজীর বললেন—আলাউদ্দিন, প্রতিজ্ঞা কর, আমার বিদ্যা কুপাত্রে দেবে না, কুসঙ্গে যাবে না, বিদ্যা ভাঙিয়ে ব্যবসা করবে না এবং বাইজীদের গান-বাজনা শেখাবে না!

আলম প্রতিজ্ঞা করল।

পরিহাসপ্রিয় নবাব সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—বাঙালীবাবু, আবার বোমা-টোমা মারবে না তো?

করজোড়ে আলম উত্তর দিল—হুজুর, মুই সুরের কাঙাল। সুরের বোমা মারবার পারি।

সরল হাস্ত-পরিহাসে পুণ্য-অনুষ্ঠান আনন্দময় হয়ে উঠল। আর সেদিন থেকেই শিবতলীর আলম রামপুরের আলাউদ্দিন হলেন—আলাউদ্দিন খাঁ।

ওয়াজীর খাঁ-ও সহজে আলাউদ্দিনকে তাঁর সুরসম্পদ দান করেন নি। বহু সেবা ও যত্নের পরে এবং তাঁর অসাধারণ অধ্যাবসায় ও মেধার পরিচয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরাণা, মিঞা তানসেনের ঘরাণা, বাংলার আলাউদ্দিনকে দান করেছেন। আর আলাউদ্দিন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আহার-নিদ্রাহীন সাধনার ভেতর দিয়ে সেই সুরসম্পদ আহরণ করেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম পড়েছে ছড়িয়ে।

অবশেষে একদিন গুরু বললেন—তোমার শিক্ষা সমাপ্ত। এবারে তুমি দেশভ্রমণে বের হও। গুণীদের বাজনা শোনাও।

আবার কলকাতা। কিন্তু এবারে আর শিবতলীর আলম নয়, রামপুরের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল বীণকার লছমী প্রসাদের সঙ্গে। তিনি তাঁর সরোদ শুনে বললেন—এ তো বীণকারের তালিম! ভারতবর্ষে নূতন জিনিস। তুমি এ বিদ্যা প্রচার কর।

সঙ্গীতসুরসিক ও শিল্পীপ্রিয় শ্যামলাল ক্ষেত্রীর চেষ্টায় আলাউদ্দিন আমন্ত্রিত হলেন ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনে। সর্বভারতীয় ওস্তাদদের আসর। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি।

একসময় তাঁর ডাক পড়ল। চারিদিকে উপেক্ষার আর অবজ্ঞার ভ্রূকুটি। তানপুরায় সুর বেঁধে মনে মনে গুরুকে প্রণাম করলেন আলাউদ্দিন। তারপরে সরোদে তান মারলেন। শ্রোতারা সচকিত হলেন, একটু নড়ে-চড়ে বসলেন।

পুরীয়া রাগে বিলম্বিত আলাপ শুরু হল, সভার গুঞ্জন থেমে গেল। আধঘণ্টা আলাপের পরে আলাউদ্দিন যখন থামলেন, তখনও শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আলাউদ্দিন সেলাম জানাবার পরে তাঁদের সম্বিৎ ফিরে এলো। তাঁরা প্রবল হর্ষধ্বনি করে শিল্পীকে অভিনন্দিত করলেন।

শিল্পী সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের আবার সেলাম করলেন। তারপরে ধরলেন গৎ, জোর, ঝালা। ছন্দ লয় ও তানে মাতিয়ে তুললেন আসর। ধ্রুপদের অঙ্গে বাঁধা সরোদ। সে সুরে যেমন ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের প্রশান্তি, তেমনি উত্তাল-সাগরের উচ্ছ্বাস।

প্রথম তবলচি হার মানলেন। এলেন আরেকজন। চার ঘণ্টা সময়

স্বপ্নের মতো কেটে গেল। প্রথম আবির্ভাবেই আলাউদ্দিন ভারতের সঙ্গীতাকাশে শুকতারা রূপে স্বীকৃতি পেলেন।

পরদিনই শ্যামলাল ক্ষেত্রী বললেন—মাইহারের মহারাজা ব্রজনাথ সিংজী আমার বিশেষ বন্ধু। অনেকদিন থেকেই তিনি রাজসভার জন্য একজন প্রকৃত ওস্তাদ চাইছেন। পাচ্ছেন না। আপনি মাইহারে চলে যান, আমি মহারাজকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।

যেতে তো মন চায়, কিন্তু যাবেন কেমন করে? আলাউদ্দিন যে কপর্দকশূন্য

শ্যামলাল বুঝতে পারলেন। তিনি রেলের টিকেট কেটে আলাউদ্দিনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আলাউদ্দিন মাইহারে এলেন। দেখা করলেন মহারাজার সঙ্গে। বয়সে তরুণ হলেও তিনি সঙ্গীতের প্রকৃত সমজদার। তিনি আলাউদ্দিনের পরীক্ষা নিলেন। রাজসভার প্রায় পঁয়তাল্লিশটি দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে খাঁ-সাহেবকে সে পরীক্ষায় পাস করতে হল।

মহারাজা তাঁকে শুধু সভাগায়ক হিসেবেই নির্বাচিত করলেন না, সেই সঙ্গে নিজের গুরুপদে বরণ করে নিলেন।

কিন্তু খাঁ-সাহেব বলে বসলেন—গান-বাজনা কইরা আর শিখাইয়া মুই পয়সা নিতে পারমু না।

—তাহলে আপনার চলবে কেমন করে গুরুজী! মহারাজা চিন্তিত। তারপরে একটু ভেবে বললেন—বেশ, আজ থেকে আপনি আমার দেবত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার। মাত্র দেড়'শ টাকা মাইনে এবং একখানি বাড়ি আমি আপনাকে দেব। এবারে গুরুমাতাকে নিয়ে এসে এখানে স্থির হয়ে বসুন।

আলমের মনে পড়ল বাসরঘরের সেই নোলকপরা গ্রাম্য কিশোরীটির কথা। যাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তাঁর টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। গত পনেরো বছরে যাঁর আর কোন খবর নেন নি। তাঁর নিজের ভাষায়—আরে ওনার টাকা মাইরাই তো মোর যত ফুটানী। বেহালা কিনছি, ক্ল্যারিওনেট কিনছি। ওনার কথা কইয়াই গুরুর কিরপা লাভ করছি। নইলে তো খাড়াইয়া খাড়াইয়াই মোর জীবন যাইত।

চিঠি গেল ত্রিপুরার শিবতলীতে। একদিন মেজদা আফতাবউদ্দিন মদনমঞ্জরী দেবীকে নিয়ে মাইহার এলেন। তখন আর তিনি একাদশী কিশোরী নন, ছাব্বিশ বছরের সরলা যুবতী। একজন সুদীর্ঘ সাধনায় সরস্বতীর বর লাভ

করেছেন, আরেকজন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে স্বামীর ঘর ফিরে পেলেন। শিবতলীর মদনমঞ্জরী মাইহারের গুরুমাতা হলেন। ঘরের দুয়ারে আঁকাবাঁকা অক্ষরে আলাউদ্দিন লিখে দিলেন—'মদিনা ভবন'!

এখানেই শেষ নয়, এর পরেও অনেক। বড ছেলের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে ওয়াজীর খাঁ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন মিঞা তানসেনের ঘরাণাকে রক্ষ করতে হলে আলাউদ্দিনই একমাত্র আধার। তাই চারশ' বছর ধরে তাঁদের ঘরে বন্দী সুরসম্পদকে তিনি আলাউদ্দিনের কাছে উজাড় করে দিলেন। আর আলাউদ্দিন সর্বশক্তি দিয়ে সে-সম্পদ গ্রহণ করলেন।

তারপরে উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিদেশ সফর। ঘরে ফিরেই কবিগুরুর আমন্ত্রণ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে ছ'মাস তিনি সেখানে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পরেই আরেকজনকে বলে বসলেন—হায়। এতকাল সুদাই ঘুইরা মরলাম! গণেশ যেমন মা-দুর্গারে প্রদক্ষিণ কইরা ত্রিভুবন প্রদক্ষিণের ফল পাইছিলেন, আমরাও তো তেমনি ওনারে প্রদক্ষিণ কইরাই দুনিয়া ঘুরার ফল পাইতে পারতাম।

তাঁর মহাজীবনের কথা অফুরন্ত। অত কথা ভাবতে বসলে রাত ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু ভাবনা শেষ হবে না। তাঁর চেয়ে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁদের 'বাবা' খাঁ-সাহেব সম্পর্কে যা শুনেছি, তার কিছু স্মৃতিচারণ করা যাক।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় হীরু গাঙ্গুলী নামে অধিক সুপরিচিত। কিন্তু বাবা তাঁকে বলতেন—তুমি হীরু নও, হীরা, আমার হীরাবাবা। ঐ নামেই তিনি তাঁকে ডাকতেন এবং খুবই স্নেহ করতেন। গাঙ্গুলীসাহেব উপস্থিত থাকলে তিনি সাধারণতঃ তাঁকেই সঙ্গত করতে বলতেন।

তিনিও গাঙ্গুলীসাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। সেকথা বলতে গেলে আজও তাঁর চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কেনই বা উঠবে না? ঘটনাটি যে তাঁর শিল্পী-জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

১৯৩৫ সাল। এলাহাবাদের নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন চলছে। ঠিক হল হীরুবাবু তবলায় লহড়া বাজাবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবেন কে? একে তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। সবে 'ল' পাস করে এটর্নীশিপের প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়েছেন, তার ওপরে সেখানে যাঁরা উপস্থিত তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রবীণ ও সর্বভারতীয় ওস্তাদ। যেমন—কৈয়াজ খাঁ, হাফেজ আলি খাঁ, হোসেন

আলি খাঁ, গোলাম রসুল খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও আলাউদ্দিন খাঁ প্রভৃতি আরও অনেকে।

চিন্তিত হীরুবাবু কাউকে বলে দেবার জন্য কথাটা বললেন আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেবকে। সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে নিজের বুক চাপড়ে সহর্ষে বলে উঠলেন—মুই বাজামু। মুই সঙ্গত করমু মোর হীরাবাবার সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল—বাংলার হীরু গাঙ্গুলী পঞ্চম শোয়ারী তালে তবলায় লহড়া বাজাবেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবেন মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁসাহেব। ষাট বছরের বিশ্ববন্দিত সুরস্রষ্টা তেইশ বছরের তরুণ তবলাবাদকের সঙ্গে সঙ্গত করলেন হাসিমুখে।

গাঙ্গুলীসাহেব আমাকে বহুদিন বলেছেন—বাবার মতো ওস্তাদ হয়তো জন্মাতে পারেন, কিন্তু তাঁর মতো মানুষ আর জন্মাবেন না। তিনি তো শুধু সাধক ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত ও যোগী। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপা লাভ করেছিলেন: সেটি ১৯৪৯ সালের কথা। কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন চলছে। সেদিনের শেষ বিষয় আলাউদ্দিনের বাজনা, সঙ্গে তবলা বাজাবেন হীরুবাবু।

সন্ধ্যেবেলাতেই আলাউদ্দিন এসে হাজির হলেন। বয়স হয়েছে, তার ওপর তখন তাঁর শরীর ভাল ছিল না। তাই পুত্র আলী আকবর বললেন—আপনার বাজনা সেই শেষরাতে। এখানে সব ব্যবস্থা আছে। এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন।

পিতা বিরক্ত হলেন। তিনি গিয়ে আসরে বসে পড়লেন।

রাত দশটা নাগাদ হীরুবাবু সেখানে উপস্থিত হলেন। অসহায় পুত্র কথাটা বললেন তাঁকে। তিনি আসরে গিয়ে খাঁসাহেবের পাশে বসে পড়লেন। একটু বাদে সুযোগ বুঝে হীরুবাবু তাঁকে বললেন—বাবা, আমাদের তো বাজনা সেই শেষরাতে, এখনও অনেক দেরি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে হত না…

—তা মন্দ কও নাই। এ্যারা নাকি ব্যবস্থা কইরা রাখছে। চলো, এট্টু ঘুমাইয়া লওয়া যাউক।

বাবাকে নিয়ে হীরুবাবু উঠে এলেন তিনতলার একখানি ঘরে।

ভোর চারটে নাগাদ বাবা হীরুবাবুকে বললেন—অরা তো এখনও ডাকতে আছে না। এই ফাঁকে এট্টু নমাজটা সাইরা লই। তিনি চিরকাল ব্রাহ্মমুহূর্তে নমাজ পড়তেন। দৈনিক পাঁচবার নমাজ পড়তেন খাঁসাহেব।

তিনি পাশের ঘরে গিয়ে নমাজ পড়তে শুরু করলেন। আর তখুনি আসর থেকে ডাক এলো।

হীরুবাবু তাড়াতাড়ি বাবাকে খবর দিতে গেলেন, পারলেন না। অন্ধকার ঘর। অথচ তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁকে। বাবা পশ্চিমমুখী হয়ে চোখ বুজে নমাজ পড়ছেন। কখনও দাঁড়াচ্ছেন, কখনও বসছেন, কখনও প্রণাম করছেন। তাঁর গা থেকে যেন একটা দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে সারা ঘরখানিকে আলোকিত করে তুলেছে। হীরুবাবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তারপরে তিরিশ বছর কেটে গিয়েছে। আজ বাবাও আর নেই ইহজগতে। কিন্তু সেদিনের কথা মনে হলে গাঙ্গুলীসাহেবের সারা শরীর আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বহু ভেবেছেন, কিন্তু তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি, সেদিন তিনি কি দেখেছিলেন? সে কি শুধুই hallucination, না অন্য কিছু?

হীরুবাবু আমাকে বলেছেন—বাবার গলায় একটা লকেট থাকত সব সময়ে। সেটির একদিকে শ্রীঠাকুর, আরেকদিকে শ্রীমায়ের ছবি ছিল। আলাউদ্দিন গিরিশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারে কাজ করেছেন, তিনি হাবু দত্তের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দকেও দেখেছেন কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করতে পারেন নি। এজন্য তাঁর বড়ই আপসোস ছিল। মাঝে মাঝেই বলতেন—হায় হায়, মুই কি দুর্ভাগা! তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তবু তাঁরে একবার দর্শন করতে যাই নাই। এই দুঃখ কুথায় রাখি?

দর্শন না করলেও তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ভাবসমাধি হত। গান-বাজনা থামিয়ে কেঁদে-কেটে আকুল হতেন।

১৯৫৩ সাল। আলমবাজারে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বাজাতে বসেছেন। হীরুবাবু সঙ্গত করছেন। হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে সরোদ রেখে দিলেন। দু-হাত ওপরে তুলে উধ্বর্মুখী হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—কি বাজাবো মা? আমি যে তোর অযোগ্য সন্তান।

তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রদ্ধেয় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আমি এই মহাপুরুষের কিছু কথা শুনেছি। নিখিলবাবু বলেছেন—তিনি বোধ হয় বিশ্বের একমাত্র সঙ্গীতশিক্ষক, যিনি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেন নি। এমন কি কেউ কোন খাবার নিয়ে এলে পর্যন্ত ফেলে দিতেন। বলতেন—মুই যে গুরু। মুই তো দিমু, নিমু ক্যান?

দিয়েছেন। সারা জীবন অমানুষিক কষ্ট করে যা কিছু আহরণ করেছেন, তা সবই দিয়ে গিয়েছেন শিষ্যদের। ভারতীয় সঙ্গীতকে তিনি ঘরাণার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে গিয়েছেন। তিনি শুধু আলী আকবর ও অন্নপূর্ণাকেই সৃষ্টি করেন নি, তিমিরবরণ, রবিশঙ্কর, পান্নালাল ঘোষ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিশ্বসঙ্গীতের আসরে তারই অমর অবদান। তাঁর বিশ্ববরেণ্য শিষ্যদের প্রায় প্রত্যেককেই তিনি বিনা খরচে নিজের বাড়িতে বছরের পর বছর রেখে তাঁর সাধনার ধন নিঃশেষে দান করেছেন কিন্তু কোন গুরুদক্ষিণা নেন নি। মাইহারের মহারাজার সামান্য মাসোহারা দিয়েই কোন রকমে সংসার খরচ নির্বাহ করেছেন।

তাঁর শিষ্যরা আজ লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন। কিন্তু আলাউদ্দিন কোনদিন স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পারেন নি। ইচ্ছে করলেই কিন্তু দেখতে পারতেন। দেশ ও বিদেশের বহু আমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করেছেন। কারণ তাহলে মাইহারের মহারাজার প্রতি নিমকহারামী হবে।

নিমকহারাম হবার ভয়টা চিরকালই তাঁর একটু বেশি ছিল। তাই শ্রদ্ধেয় শচীনদেব বর্মন ঘরে ঢুকলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন। বলতেন—তোমরা রাজা, তোমাগো নিমক অনেক খাইছি। তোমার সামনে চেয়ারে বইতে পারুম না। বাধ্য হয়ে শচীনদেবকেই বাবার পাশে মাটিতে বসতে হত।

একবার কলকাতায় এসে একদিন নিখিলবাবুকে নিয়ে চলে গেলেন রাজেন মল্লিকের বাড়িতে। কাঙালী ভোজনের জায়গাটা দেখিয়ে বললেন—এইখানে দিনের পর দিন খাবার পাইছি, তাই এট্টু দেখতে আইছিলাম। এ্যারা বড় ভাল মানুষ। আল্লা! এ্যাগো দোয়া কইরেন।

নিখিলবাবুও আমাকে বলেছেন—তিনি শুধু সঙ্গীতস্রষ্টা ছিলেন না, ছিলেন তপস্বী। তাঁর সঙ্গীতসাধনার মূলে ছিল আত্মোপলব্ধি। তাঁর সঙ্গীতচর্চার মধ্যে Sex বা Passion-এর কোন স্থান ছিল না। তিনি কখনও বাঈজীবাড়ির মহফিলে অংশ নেন নি। নাড়া বাঁধার সময়ে আমাদের দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, আমরা কোন বাঈজীকে গান-বাজনা শেখাতে পারব না।

নিখিলবাবু একনাগাড়ে পাঁচ বছর মাইহারে ছিলেন, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭। তখনকার দিনে মাইহারে দৈনিক মাত্র তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যেত—বিকেল ছ'টা থেকে রাত ন'টা। সবাইকে তাই সন্ধ্যার পরেই খেয়ে নিতে হত। খাবার পরে শেখার কোন কড়াকড়ি ছিল না। কেউ রেওয়াজ করতেন, কেউ

বা শুয়ে পড়তেন। কারণ বাইকে শেষরাতে উঠতে হত এবং সারাদিনই রেওয়াজ করতে হত।

গরমের দিনে বাবা উঠানে একখানি খাটিয়ায় ঘুমোতেন। শোবার আগে তিনি কিছুক্ষণ আপন মনে বাজাতেন। তখন কারও সামনে থাকার উপায় ছিল না। সবাই ঘরে বসে নীরবে সেই বাজনা শুনতেন। সে কি বাজনা! মনে হত যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসছে সেই সুরসুধা। একটা অসহ্য পুলকে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। বুকটা ফেটে যেতে চাইত। তবু তাঁরা সে বাজনা শুনতেন।

নিখিলবাবু বলেছেন—আপনারা জানেন, মাইহারে খুব সাপ। অথচ আমাদের বাড়ির কাউকে কখনও সাপে কামড়ায় নি। চাঁদনীরাতে বহুদিন দেখেছি একাধিক সাপ বাবার খাটিয়ার কাছে এসে ফণা তুলে বাজনা শুনছে। বাজনা বন্ধ করলেই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

—বাবার দেহ ও মনে সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি আমাদের বলতেন, যতক্ষণ জেগে থাকবি, ততক্ষণ রেওয়াজ করবি। আমি দিনে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত রেওয়াজ করেছি। সুরচর্চায ভুল হলে আর রক্ষা ছিল না। একদিন মাইহারের মহারাজাকে পর্যন্ত হাতুড়ি ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

—শুধু সুরকার নয়, বাবা ছিলেন বিশিষ্ট বাঙালী। তিনি সত্তর বছর মাইহারে থেকেও হিন্দী বড একটা বলতেন না, এমন কি কলকাতার কথা পযন্ত ব্যবহার করতেন না, সর্বদা তাঁর দেশী ভাষায় কথা বলতেন।

আলাউদ্দিন খাঁ-য়ের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ। তিনি নিজে কালীভক্ত ছিলেন। তাঁর বড ভাই আফতাবউদ্দিনও তান্ত্রিক ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে শিখতে এলে বাবা তাকে বলতেন—আগে মন্দিরে যাও, সারদামায়ীরে বাজনা শোনাইয়া আও। হেয়ার পরে মুই শুনমু।

নিখিলবাবু আমাকে বলেছেন—বাবা জীবনে কোনদিন মাংস খান নি। তিনি কখনও মদ স্পর্শ করেন নি। নিরামিষই বেশি পছন্দ করতেন। গরুকে বলতেন গোমাতা। দুধ বন্ধ করে দিলেও গরু বিক্রি করতেন না, পাছে সে কষাইদের হাতে পড়ে। গোমাতাকে নিয়ে তিনি গান রচনা করেছেন। হিন্দুশিষ্য রবিশঙ্করজীর সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম সন্তান অন্নপূর্ণাদির বিয়ে দিয়েছেন, নাতনীর (আলি আকবর খাঁ-য়ের মেয়ে) বিয়ে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধশিষ্য স্টেনলী পেরেরার সঙ্গে। বক্ষচক্ষু অবলম্বন করে তাঁর শিষ্যরা সুরসাধনা করতে

হত। তাই গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে দেখতে পারতেন না। তাঁরা তাঁকে হিন্দু বলতেন, বলতেন বিধর্মী কাফের।

—কথাটা কিন্তু সত্য নয়। ধর্মের দিক থেকে বাবা অত্যন্ত উদার মত পোষণ করলেও তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। শুধু দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তেন না, তিনি একাধিকবার হজ-যাত্রায় গিয়েছেন। দেশে মসজিদ তৈরি করে দিয়েছেন।

তবু গোঁড়া মুসলমানরা সুযোগ পেলেই তাঁকে অপদস্ত করতেন। হজ-যাত্রাকালে তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি তাঁর দেহরক্ষার পরেও তাঁরা নানা ছল-ছুতো করে শেষকৃত্যে বাধা দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালেই ৬ই সেপ্টেম্বর মহর্ষি আলাউদ্দিন খাঁ মাইহারে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। উনবিংশ শতকের এক অখ্যাত সন্ধ্যায় ত্রিপুরার শিবতলী গ্রাম থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে মহাসমারোহে মধ্যপ্রদেশে তার যতি পড়ল।

মহাপ্রয়াণ-মুহূর্তে নিখিলবাবু ও শ্রীপেরেরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। আলী আকবর এবং রবিশঙ্কর তখন ভারতের বাইরে। তাঁদের খবর দিয়ে তিন দিন তাঁকে বাড়িতে বরফের ওপর শুইয়ে রাখা হল। শুদ্ধচিত্ত আচার্যের মরদেহ অবিকৃত রইল, কিন্তু পুত্র ও জামাতা এলেন না।

নিরুপায় নিখিলবাবুরা তখন তাঁকে সমাধিস্থ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্থানীয় মোল্লারা বলে বসলেন, তাঁরা কোন সহযোগিতা করবেন না।
—তখন কাটনী থেকে কবির নামে বাবার এক আত্মীয়কে নিয়ে এলাম আমরা। নিখিলবাবু বলেছেন—তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় অপর পক্ষ নিমরাজী হল। বলল, বাড়িতে যত হিন্দু দেব-দেবী ও মহাপুরুষের ছবি আছে, সব ফেলে দিতে হবে।

—শেষ পর্যন্ত আমরা সে শর্ত মেনে নিলাম। তবে ছবিগুলো ফেলে দিলাম না, সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু তারপরেই মোল্লারা বলে বসলেন, কোন অমুসলমান বাবাকে ছুঁতে পারবে না। বলা বাহুল্য এবারে আমাদের শক্ত হতে হল। বললাম, তা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের বাবা। আমরা মুসলমান না হয়েও তাঁর সন্তান। ছেলে হয়ে আমরা বাবাকে ছুঁতে পারব না কেন?

—এবারে মোল্লারা হার মানলেন। বললেন, বেশ অন্তিমযাত্রায় তোমরা শবাধারের একদিক বইতে পারো, কিন্তু তোমাদেরও আল্লা-হো-আকবর বলতে হবে।

—সহাস্তে বললাম, আ যা বাবার ছেলে। আমাদের কাছে, 'বল হরি বোল', 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' আর 'আল্লা-হো-আকবর' একই কথা।

অতএব শবাধারের একদিকে রইলেন মুসলমান, আরেকদিকে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান। একদিকে মসজিদের ইমাম, আরেকদিকে সারদামায়ী মন্দিরের সেবাইত। একদিকে মাইহারের মহারাজা, আরেকদিকে পথের ফকির। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সবাই সেদিন চোখের জলের নৈবেদ্য দিয়ে মহাত্মা আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

আলাউদ্দিনের পরমপ্রিয় মাইহার পরিক্রমা পূর্ণ করে শোভাযাত্রা ফিরে এসেছে মদিনা-ভবনে। সেখানেই শেষ শয্যা পেতেছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। সাঙ্গ হয়েছে শতবর্ষের সঙ্গীতসাধনার এক গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় ইতিহাস। আর সেই সঙ্গে মদিনা-ভবন রূপান্তরিত হয়েছে ভারতের অন্যতম পুণ্যতীর্থে।

॥ তিন ॥

"জেঠু, ও জেঠু! বলো না গো, তোমরা কবে ফিরে আসছ?"

পুনুর প্রশ্নের কি উত্তর দোব বুঝতে পারি না। তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু নিষ্কৃতি পাই না। এবারে বুলুও বোনের সঙ্গে যোগ দেয়। পুনুর মতই আমার একখানি হাত ধরে বলে, "তোমরা তো পরশু ফিরে আসছ আমাদের বাড়িতে। শুনেছি একদিনেই খাজুরাহো দেখা হয়ে যায়।"

এবারেও নীরব থাকি। আর সেই নীরবতাকেই বোধ হয় সম্মতি ভেবে বাবু বলে ওঠে, "ফেরার পথে কিন্তু আমাদের বাড়িতে দু-দিন থাকতে হবে জেঠু। হিমালয়ের গল্প বলতে হবে।"

"ইস্‌, কি মজা হবে!" বুলু হাততালি দেয়।

"কি মজা, কি মজা……" পুনু আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। কারণ ফেরার পথে আমরা আর সাতনায় আসছি না। খাজুরাহো থেকে বাসে করে ছতরপুর ও সাগর হয়ে জবলপুর চলে যাচ্ছি।

সেকথা বললে ওরা কান্না জুড়ে দিত। তাই মিথ্যে কথা বলতে হল। এমনি

মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয় বলেই বাইরে বেরিয়ে আমি কারও বাড়ি উঠতে চাই না। মায়াময় জগৎ। মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারি না। আর তাই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীরা আমাদের মায়াবাদী বলেন। বললেও আমি নিরুপায়। কারণ যুক্তি দিয়ে হৃদয়কে বশ মানানো যায় না।

আমার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পুনু ও বুলু হাসিমুখেই বিদায় দিল আমাদের।

বৌমা চুপি চুপি বলেন, "দাদা, আবার কখনও এদিকে এলে পায়ের ধুলো দিতে দ্বিধা করবেন না।"

ঘাড় নেড়ে রিক্সায় উঠে বসি। ডাক্তারবাবু এবং বাবু স্কুটারে করে সঙ্গী হল আমাদের। ওরাও বাস স্ট্যাণ্ডে এলো। মালপত্র রাখার ও আমার বসার ব্যবস্থা করে ওরা দাঁড়িয়ে রইল বাসের বাইরে। বাস ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

অবশেষে বাস চলতে শুরু করে। বাবু ও ডাক্তারবাবু হাত নেড়ে বিদায় জানান। আমরাও হাত নাড়ি। গতকাল এমন সময়ও পরিচয় হয় নি ওঁদের সঙ্গে। তবু আজ মনে হচ্ছে ওঁরা আমার অতি আপনজন, পরমাত্মীয়।

বাস এগিয়ে চলে। ডাক্তারবাবু আর বাবু মিশে যায় জনতার মাঝে—ওরা হারিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। কিন্তু জেগে থাকে মনের মুকুরে। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি মুখ—বৌমা, বুলু ও পুনু।

কিন্তু না, আর ওদের কথা নয়। আমি পথিক, পথের কথা ভাবতে হবে এবারে—সাতনা থেকে খাজুরাহের পথ। দূরত্ব ১১৭ কিলোমিটার। বাসভাড়া ছ'টাকার মতো।

গত বছরও এই জানুয়ারী মাসেই আমি খাজুরাহো গিয়েছিলাম। তখনও সাতনা হয়েই গিয়েছি। তবে সাতনায় নামা হয় নি। জবলপুর থেকে বাসে সোজা খাজুরাহো চলে গিয়েছি। প্রতিদিন সকাল ন'টা নাগাদ জবলপুর থেকে খাজুরাহো এক্সপ্রেস বাস ছাড়ে। দূরত্ব ৩৭৪ কিলোমিটার, ভাড়া বিশ টাকার মতো। ঘণ্টা ন'য়েক সময় লাগে। পথে পড়ে কাটনি সাতনা ও পান্না। আজও আমরা পান্না হয়েই খাজুরাহে যাব।

গত বছর আমার সঙ্গে ছিল জবলপুরের দুটি বাঙালী যুবক শেখর বল ও তপন গোস্বামী। আরা দুজনেই জবলপুরের ভেইক্ল্ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। আমি খাজুরাহো যাব শুনে কারখানায় কামাই ক'রে সঙ্গী হয়েছিল আমার।

মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী কারখানার মতো ভেইক্ল্ ফ্যাক্টরীতেও

বেশ কিছু বাঙালী কাজ করেন। তাঁরা প্রায় সকলেই কারখানার কলোনীতে থাকেন। ফলে সেখানে তৈরি হয়েছে চমৎকার একটি কালীবাড়ি এবং সেই সঙ্গে পাঠাগার। কালীভক্তরা কিন্তু কেবল পাঠক নন, পর্যটকও বটে। ওঁরা প্রায় প্রতি বছরই বাস ভাড়া করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য হিমালয়ও বাদ যায় না। ওঁদের দলনেতা কাশীনাথ দত্ত যে রীতিমত হিমালয়-প্রেমিক! আর তাই বছর দুয়েক আগে ঋষিকেশে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। দেখে খুশি হয়েছিলাম ওঁরা আমার 'মানালীর মালঞ্চে' বইখানি হাতে নিয়ে কুলু উপত্যকা ভ্রমণ করে ঋষিকেশ গিয়েছিল।

কাশীনাথ তখুনি আমাকে জবলপুর যাবার নিমন্ত্রণ করেছিল। তাই গত বছর জবলপুর যাবার আগে যোগাযোগ করেছিলাম ওঁদের সঙ্গে। যোগাযোগ করার আরও একটি কারণ ছিল। আমার অনুজপ্রতিম পর্বতারোহী বিভাস দাসের ছোটভাই অঞ্জনও কাশীনাথের সহকর্মী এবং প্রতিবেশী।

কিন্তু জবলপুরের কথা এখন থাক, খাজুরাহের কথা ভাবা যাক। গত বছর জানুয়ারী মাসে গোস্বামী ও বলের সঙ্গে খাজুরাহো গিয়েছি। তবু আজ আবার খাজুরাহে চলেছি। চলেছি কারণ গত বছর মাত্র এক দিন খাজুরাহে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতে আমার মন ভরে নি। তাই আবার চলেছি সেই অপরূপ রূপতীর্থে—সেই মন্দিরনগরীতে।

মন্দিরনগরী খাজুরাহো এখন একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু সেকালে ছিল চন্দ্রবংশীয় রাজপুত চান্দেলা রাজাদের রাজধানী। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুশ বছরে চান্দেলা রাজারা সেখানে পঁচাশিটি অপরূপ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একটি সুবিশাল হ্রদের তীরে এবং তার চারিদিকে প্রায় আট বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল সেই মন্দিরনগরী। এই এলাকাটি প্রায় সমতল এবং চারিদিক ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

মহাকালের করাল স্পর্শ এবং মানুষের অবহেলা ও অযত্নে মহানগরী খাজুরাহো আজ একটি গণ্ডগ্রাম। সেকালের রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্ন আর নেই সেখানে। অধিকাংশ মন্দিরও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাহলেও মুছে যায় নি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের সেই শাশ্বত সৃষ্টি। খাজুরাহো গ্রামের চারিদিকে আজও প্রায় পাঁচশটি ছোট-বড় মন্দির মাথা উঁচু করে রয়েছে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। খাজুরাহো সেকালের মুসলমান আক্রমণকারীদের পথের ওপরে অবস্থিত নয়।

বাস এগিয়ে চলেছে। সাতনা শহর ছাড়িয়ে এসেছি। সিমেন্ট কারখানাগুলোর সাদা ধোঁয়াও আর দেখা যাচ্ছে না। পথের ধারে গাছের সারি। তারপরে সমতল ক্ষেত অথবা কাঁটাবনে বোঝাই রুক্ষ প্রান্তর। মাঝে মাঝে দু-একটি গ্রাম।

সোজা ও সমতল মসৃণ পথ। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পরিবহনের বাস এগিয়ে চলেছে দুর্বার বেগে। আমরা সাতনা থেকে খাজুরাহো চলেছি। পথে পড়বে দেবেন্দ্রনগর, পান্না ও বাম্মিঠা।

পথের কথা থাক। যন্ত্রযানের সওয়ার হয়ে পথের ভাবনা অর্থহীন। পায়ে-পায়ে পেরুতে হয় যে পথ, সেই পথের কথাই কেবল বলা যায় ঘটা করে। অতএব এখন আর পথের কথা নয়, তার চেয়ে আবার খাজুরাহের কথা ভাবা যাক—ইতিহাসের খাজুরাহো।

আমরা আজ যেখানে যাচ্ছি, সেই খাজুরাহো ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুসভ্য এবং সাংস্কৃতিক কীর্তির জন্য বিখ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এ অঞ্চল ভারতের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের নাম ছিল বৎসদেশ, মধ্যযুগে বলা হত জেজাভুক্তি ( Jejabhukti ) আর খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ভারতবর্ষের এই অংশ বুন্দেলখণ্ড নামে সুপরিচিত হয়। বৃটিশ আমলে খাজুরাহো ছিল ছতরপুর রাজ্যে, আর এখন ছতরপুর জেলায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ খাজুরাহের প্রথম বিদেশী পর্যটক। তিনি খাজুরাহে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙ খাজুরাহো সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন—'The soil was rich, the crops were abundant.'

আজকের খাজুরাহে অবশ্য এর একটি কথাও সত্য নয়। এখন সেখানে নেই কোন বৌদ্ধবিহার। আর বর্তমানে খাজুরাহের মাটি মোটেই উর্বরা নয়। খুব সামান্যই ফসল হয় সেখানে। বোধ করি কোন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেই খাজুরাহো আজ শুষ্ক প্রান্তরে পর্যবসিত। আর তাই সেকালের সেই সমৃদ্ধ নগরী একালে গণ্ডগ্রামে পরিণত।

অষ্টম থেকে দশম শতকে প্রতিহারবংশীয় রাজারা মধ্যভারতে রাজত্ব করতেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চান্দেলাবংশীয় রাজারা খাজুরাহের বিস্ময়কর মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছেন।

চান্দেলাদের রাজত্বকালেই খাজুরাহো ভারতের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গজনীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আল বিরুণি ভারতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণে খাজুরাহের উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর বন্ধু মাহমুদ এ অঞ্চলে আসেন নি। ভালই করেছেন। এলে হয়তো আজ আর আমাদের খাজুরাহো আসার প্রয়োজন পড়ত না।

১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত পর্যটক ও ঐতিহাসিক ইবন বতুতা খাজুরাহো এসেছিলেন। তার আসার প্রায় একশ' বছর আগে খাজুরাহে চান্দেলা বংশের রাজত্ব শেষ হয়েছে। তবু ইবন বতুতা লিখেছেন—'...the place was inhabited by a tribe of Jogis with long and clotted hair... Many of the moslems of those parts attended upon them to learn magic.'*

অর্থাৎ চতুর্দশ শতকেও খাজুরাহো ধর্মস্থানরূপে বিখ্যাত ছিল এবং তখন সেখানে মুসলমানরা বসবাস করা শুরু করলেও তাদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল।...

ইতিহাসের ভাবনা হারিয়ে যায়। আমাদের বাস পান্না বাস স্ট্যাণ্ডে এসে থেমেছে। শুরু হয়েছে যাত্রীদের ওঠা-নামা। পনেরো মিনিট বাস থামবে এখানে। অতএব নিচে নেমে একটু হাত-পা খেলানো যাক।

আমরা সাতনা থেকে ৭১ কিলোমিটার পথ এসেছি। পৌনে দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে। এখান থেকে খাজুরাহো ৪৫ কিলোমিটার।

বাস থেকে নেমে আসি। রণজিৎ ভাঁড়ে করে চা নিয়ে আসে। চায়ে চুমুক দিয়ে কর্মব্যস্ত বাস স্ট্যাণ্ডকে দেখতে থাকি। পান্না বৃটিশ আমলে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল, এখন জেলা।

পান্না শহরটির অবস্থান ২৪°৪৩′ উঃ অক্ষরেখা ও ৮০°১২′ পূঃ দ্রাঘিমায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রসল নামে জনৈক বীর এই উপত্যকাটি অধিকার করে এখানে নগরীর পত্তন করেন এবং ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পান্না রাজধানীরূপে উন্নীত হয়। শহরটি সমুদ্রসমতা থেকে ৮০০ ফুট ওপরে এবং চারিপাশের পর্বতশ্রেণী থেকে ৩০০ ফুট নিচে অবস্থিত।

* 'Khajuraho' by Vidya Prakash.

পান্না খুব বড় শহর নয়। আয়তন মাত্র ১·৩৭ বর্গকিলোমিটার। সালের গণনা অনুযায়ী শহরের জনসংখ্যা ছিল ২২,৩১৬ জন, তাঁদের মধ্যে ১০,৪৮৭ জন মেয়ে। তখন ৪০৩০টি বাড়ি ছিল শহরে, সেই সব বাড়িতে ৪৫০৭টি পরিবার বাস করতেন। বলা বাহুল্য গত নয় বছরে জনসংখ্যা ও বাড়ি কিছু বেড়েছে।

বাড়িঘর প্রায় সবই দেখছি স্থানীয় পাথরে তৈরি। শুনেছি পান্নায় বেশ ভাল কয়েকটি মন্দির আছে। সব চেয়ে দর্শনীয় হল বলরাম বা বলদেওজীর মন্দির। মহারাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহের ইংরেজ স্থপতি মিঃ ম্যান্‌লি সেণ্ট্‌ পল্‌স ক্যাথিড্রেলের অনুকরণে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন মন্দিরটি জরাজীর্ণ, তাহলেও অবশ্য দর্শনীয়।

পান্না শহরের সব চেয়ে বিখ্যাত ধর্মস্থান কিন্তু প্রাণনাথ মন্দির। সুপ্রাচীন মন্দির—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। প্রাণনাথ জাতিতে ক্ষত্রিয়। ব্যবসা করতে এখানে এসে তিনি এ-রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া হীরকখনি আবিষ্কার করেন। তাঁর খ্যাতি কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, ধর্মপ্রচারকরূপেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

প্রাণনাথ মুসলমান ধর্ম সম্পর্কীয় প্রচুর পুস্তক পাঠ করেন। ব্যবসা ছেড়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি প্রমাণ করেন যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ফলে তাঁর নূতন ধর্মমত এ-অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর শুধু এ-অঞ্চলই বা বলি কেন? তাঁর ধর্মমত সুদূর নেপাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আজও তাঁর কিছু শিষ্য রয়েছে এ-সব অঞ্চলে, তাঁদের 'ধামাস' বা 'প্রাণনাথী' বলা হয়।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠে আসি বাসে। এখান থেকে কয়েকজন নূতন যাত্রী উঠেছেন। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে আলাপ হয়। কথায় কথায় তিনি জানান—ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরকখনি এখানে অবস্থিত। গভীর খনি এখন সবটাই সরকারী নিয়ন্ত্রণে। তবে অগভীর খনি এখনও হীরক-ব্যবসায়ীদের হাতে।

জিজ্ঞেস করি, "গভীর খনি এখান থেকে কত দূরে?"

"তা প্রায় ১৪ মাইল হবে।"

"দেখা যায়?"

"হ্যাঁ। অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। অনেকটা

কয়লা খনির মতো—মাটির নিচে সে আরেক জগৎ। সময় থাকলে কাল গিয়ে দেখে আসতে পারেন।”

আমাদের সময় নেই। সুতরাং চুপ করে থাকি।

একটু বাদে ভদ্রলোক আবার বলেন, “এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় আর তার প্রায় সবটাই চালান যায় কলকাতায়। আমরা মাছ খাই না কিনা!”

“তাহলে তো মাছ এখানে খুব সস্তা?”

“জী হা।”

পান্নায় যাত্রাবিরতির এটি আরও বড় আকর্ষণ। এখন বাঙালীর কাছে হীরার চেয়ে মাছের মূল্য বেশি। তবু বাস থেকে নেমে যেতে পারছি না। আমি যে পথিক। পথের টানে মাছের মায়া ছাড়তে হল।

আবার যাত্রা শুরু হল। জনবহুল সংকীর্ণ শহুরে পথ ধরে ধীরে ধীরে বাস চলল এগিয়ে। পথের পাশে বাড়িঘর দোকানপাট। খানিকটা দূরে একটি সবুজ পাহাড়। তার গায়েও বড় বড় বাড়ি। একটি সুবিশাল জলাশয় পেরিয়ে এলাম। শুনেছি পাহাড়ী প্রকৃতি হলেও পান্না জেলায় বেশ বৃষ্টি হয়। এমনি বহু জলাশয় আর একাধিক নদী আছে এ জেলায়। এবং তাই এখান থেকে কলকাতায় নিয়মিত মাছ চালান যায়।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। খাজুরাহো আর খুব দূরে নয়। অতএব ইতিহাসের ভাবনাটুকু শেষ করে নেওয়া যাক।

চান্দেলা রাজাদের রাজত্বকালেই খাজুরাহো তার সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। কলঞ্জর, মাহোবা এবং খাজুরাহো নিয়ে ছিল চান্দেলা রাজ্য। চান্দেলা রাজারা সাড়ে চারশ' বছর ধরে এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন।

চান্দেলা বংশের সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাক, তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। কনৌজের প্রতিহার সম্রাটদের সাধারণ সামন্ত হিসেবে তাঁরা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে এ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে নিজেদের স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেন এবং ভারতের একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ও শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হন।

নান্নুক হলেন চান্দেলা বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি একজন শক্তিশালী ও সাহসী বীর ছিলেন। কথিত আছে তিনি নাকি খালি হাতে একটি সিংহকে হত্যা করেছিলেন।

তাই চান্দেলা রাজবংশের প্রতীক ( Symbol ) হল একটি সিংহ ও মানুষের মূর্তি। সিংহটি দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটি তার সামনে বসে খালিহাতে তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। খাজুরাহের বিভিন্ন মন্দির ও মিউজিয়ামের সামনে এই প্রতীক রয়েছে।

নান্নুকের ছেলের নাম বাকপতি। তাঁর দুই ছেলে জয়শক্তি ও বিজয়শক্তি। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জয়শক্তি খাজুরাহের রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পরে বিজয়শক্তি সিংহাসনে বসেন। তাঁরা দুজনেই বীর ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়।

বিজয়শক্তির পরে তাঁর পুত্র রাহিল রাজা হন। তিনি কয়েকটি মন্দির নির্মাণ এবং জলাশয় খনন করেন। মাহোবাতে এখনও রাহিল-সাগর নামে সুপ্রাচীন জলাশয় রয়েছে। খাজুরাহে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের যে 'ডরমিটরী' রয়েছে, তারও নাম—রাহিল জনতা হোটেল।

রাহিলের পরে তাঁর ছেলে হর্ষ খাজুরাহের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজের প্রতিহার রাজা ক্ষিতিপাল অথবা মহীপালকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। সংবাদ পেয়ে হর্ষ ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রকে পরাজিত করে মহীপালকে পুনরায় কনৌজের সিংহাসনে বসান। তাঁর এই বীরত্ব ও মহত্ত্বে সারা ভারতে হর্ষের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং চান্দেলা বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়।

অনেকের মতে মহামতি হর্ষ তাঁর এই রাষ্ট্রকূট বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য মাতঙ্গেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। এটি বর্তমান খাজুরাহের একমাত্র জীবিত মন্দির।

হর্ষের দেহরক্ষার পরে ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তার পুত্র যশোবর্মন বা লক্ষবর্মন খাজুরাহের সিংহাসনে বসেন। লক্ষবর্মন তাঁর পিতার চেয়েও শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূট ও পাল রাজাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করে পাহাড়ীদুর্গ কলঞ্জর দখল করেন। প্রতিবেশী রাজারা তাঁর শক্তি স্বীকার করে নেন। ফলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খাজুরাহো একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

তাঁর ছেলের আমলের ( ৯৫৪ খ্রীঃ ) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, যশোবর্মন খাজুরাহে একটি আশ্চর্য-সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ এবং সুবিশাল জলাশয় খনন করেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যার আলেকজাণ্ডার

কানিংহ্যামের মতে সেটিই বর্তমানের লক্ষ্মণ মন্দির। এবং সমসাময়িক কালে মধ্যভারতের সব চেয়ে কারুকার্যময় মন্দির।

কিন্তু মন্দিরের কথা এখন নয়। কয়েক ঘণ্টা বাদেই তো আমরা সে মন্দির দেখতে পাবো। এখন ইতিহাসের খাজুরাহের কথা ভাবা যাক।

যশোবর্মনের মৃত্যুর পরে তাঁর উপযুক্ত পুত্র ঢঙ্গ খাজুরাহের রাজা হন। তিনি চান্দেলা রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ৯৫০ থেকে ১০০২/৩ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ৫২/৫৩ বছর ধরে তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে খাজুরাহো সর্বপ্রকার উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে।

মহারাজা ঢঙ্গের রাজত্বকাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। তিনি প্রতিহার আক্রমণ প্রতিহত করে চান্দেলা শক্তিকে সুসংহত করেন। তাঁর রাজত্বকালে চান্দেলা রাজ্য বিদিশা থেকে গোয়ালিয়র এবং বারাণসী থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ঢঙ্গ শুধু একজন দিগ্বিজয়ী বীর কিংবা বড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, তাঁর শিল্পানুরাগ ছিল অসাধারণ। তাঁরই রাজত্বকালে বর্তমান খাজুরাহের দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির নির্মিত হয়েছে—বিশ্বনাথ ও পার্শ্বনাথ মন্দির। ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেই বিশ্বনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে একটি পাথরের ও একটি পান্নার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য বহুকাল আগেই পান্নার লিঙ্গমূর্তিটি অপহৃত হয়েছে।

পাহিল্য নামে মহারাজা ঢঙ্গের জনৈক জৈন বন্ধু তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পার্শ্বনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে ধর্মের দিক থেকে ঢঙ্গ অত্যন্ত উদার মত পোষণ করতেন।

তাঁর রাজত্বকালে (১০০১ খ্রীঃ) কোক্কালা নামে গ্রহপতি পরিবারের জনৈক ধনী খাজুরাহে বৈদ্যনাথ নামে আরেকটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তবে ইতিহাস সে মন্দিরটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

মহারাজা ঢঙ্গ একজন বিদ্বান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের জনক মহর্ষি গৌতম অক্ষপাদের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় খাজুরাহে একটি ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঢঙ্গ দেহরক্ষা করার পরে তাঁর ছেলে গণ্ড খাজুরাহের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকাল (১০০২/৩—১০১৭ খ্রীঃ) সংক্ষিপ্ত ও শান্তিপূর্ণ। বর্তমান খাজুরাহের জগদম্বা (বৈষ্ণব) এবং চিত্রগুপ্ত (সূর্য) মন্দির দুটি সম্ভবতঃ তাঁরই আমলে নির্মিত।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডের ছেলে বিদ্যাধর খাজুরাহের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালও সংক্ষিপ্ত। তিনি মাত্র বারো বছর (১০১৭—১০২৯ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছেন। কিন্তু এই সময়টাও খাজুরাহের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ। মুসলমান ঐতিহাসিক Iban'l-Athir তাঁকে সেকালের সব চেয়ে শক্তিশালী ভারতীয় রাজা বলে অবিহিত করেছেন।

বিদ্যাধর তৎকালীন মধ্যভারতের অপর দুই শক্তিশালী রাজ্য কালাচুরি ও পারমারকে পরাজিত করেন। তিনি ১০১৯ ও ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মাহমুদ বহু চেষ্টা করেও চান্দেলা দুর্গ কলঞ্জর অধিকার করতে পারেন নি। এই দুর্গ সম্পর্কে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখে গিয়েছেন—'Which has no equal in the whole country of Hiudustan for strength and impregnability.'

মহারাজা বিদ্যাধর কেবল মহাবীর ছিলেন না, ছিলেন একজন পরমধার্মিক শিবসাধক। তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের শিল্পসাধনার যোগ্য উত্তরসাধক। বর্তমান খাজুরাহের সব চেয়ে উঁচু ও সব চেয়ে সুন্দর মন্দির কাণ্ডারিয়া মহাদেব তাঁর শিল্পানুরাগের অক্ষয় কীর্তি।

বিদ্যাধরের তিরোভাবের পর থেকেই চান্দেলা সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। কালাচুরি ও মুসলমান আক্রমণই এই পতনের প্রধান কারণ। তবে তারপরেও চান্দেলা রাজারা ২৬০ বছর এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। অবশ্য তখনকার চান্দেলা রাজ্যে রাজধানীরূপে খাজুরাহো ক্রমেই তার মূল্য হারিয়ে ফেলেছিল। কারণ বহির্শক্তির আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজারা রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে মাহোবা, অজয়গড় ও কলঞ্জর প্রভৃতি পাহাড়ী দুর্গেই বেশির ভাগ সময় ক 'য়েছেন।

বিদ্যাধরের পরে চান্দেলা রাজ্যের রাজা হন বিদ্যাপাল। তিনি ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পরে কীর্তিবর্মন। তিনি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালের চান্দেলা রাজারা হলেন—সাল্লক্ষণ (১১০০-১১১৫ খ্রীঃ), জয়বর্মণ (১১১৭-২০ খ্রীঃ), পৃথ্বিবর্মণ (১১২০-২৯ খ্রীঃ), মদনবর্মণ (১১২৯-৬৩), পারমারদি (১১৬৫-১২০২), ত্রৈলোক্যবর্মণ (১২০৩-৫০), বীরবর্মণ (১২৫০-৮৬) ও ভোজবর্মণ (১২৮৬-৮৮)। ভোজবর্মণের পরে চান্দেলা রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে হারিয়ে গিয়েছে।

মহারাজা বিদ্যাধরের তিরোভাবের পরে চান্দেলাদের রাজনৈতিক মূল্য কমে গেলেও স্তব্ধ হয় নি খাজুরাহের শিল্পসৃষ্টি। অবশ্য তারপরে আর কাণ্ডারিয়া

মহাদেব মন্দিরের মতো অত বড় মন্দির তৈরি হয় নি খাজুরাহে। কিন্তু নির্মিত হয়েছে—বামন, আদিনাথ, জাভেরী, চতুর্ভুজ ও দুলাদেও প্রভৃতি মন্দির। এগুলি আকারে ছোট হলেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের।

এখনও খাজুরাহে যে কয়েকটি মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে সবার শেষে তৈরি হয়েছে দুলাদেও মন্দিরটি। এই মন্দিরের নির্মাণকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই খাজুরাহো মন্দির-নগরী রূপে তার মূল্য হারিয়ে ফেলেছিল। ইবন বতুতার ঐতিহাসিক ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে পুণ্যময় মন্দিরনগরীরূপে ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খাজুরাহের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইবন বতুতা খাজুরাহোকে বলেছেন 'কাজাড়া' (Kajarra)। তৎকালীন খাজুরাহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'Where there is a great pond about a mile in length, near which are temples containing idols which the Muslims have mutilated. In the centre of that pond there are three cupolas of red stone each of three storeys ; and at the four corners of the pond cupolas in which live a body of the jogis who have clotted their hair and let them grow so that they became as long as their bodies and on account of their practising asceticism their colour had become extremely yellow. Many Musalmans follow them in order to take lessons from them.'*

## ।। চার ।।

"মহারাজ! পাহাড়ী পথ।"

সৌরীনবাবুর ডাকে আমার ভাবনা যায় হারিয়ে। আমি অতীতের খাজুরাহো থেকে বর্তমানের পান্না-খাজুরাহো পথে ফিরে আসি। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে আমাদের বাস চড়াই ভাঙছে। ছোট ছোট পাহাড়।

* Mahdi Husain, 'The Rehla of Iban Battuta'.

কোথাও তেমন গভীর খাদ নেই। কাজেই পথ মোটেই বিপজ্জনক নয়। তাহলেও বনময় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পাহাড়ী পথ।

আর তাই সৌরীনবাবু ডাক দিয়েছেন আমাকে। আমি যে পাহাড়ীপথ ভালোবাসি, কথাটা জানা আছে ওঁর।

এ পাহাড় সে পাহাড় নয়। তবু তো পাহাড় আর পাহাড়ীপথ। আমি দেখি, দু'চোখ ভরে দেখি। পথের পাশে বন। জানা-অজানা ছোট-বড় গাছের সমারোহ আর সেই সঙ্গে বনফুলের মেলা। মাঝে মাঝে দু-একটি ঝরণা।

এটি একটি অভয়ারণ্য। জন্তু-জানোয়ার অবশ্য চোখে পড়ছে না। শুনেছি তারা বড় একটা এই পথের ধারে আসে না। তবে নানা রকমের পাখি দেখতে পাচ্ছি। আর দেখছি নানা রঙের প্রজাপতি। তারা ফুলের সঙ্গে মিতালি করে চলেছে। সত্যি সুন্দর, ভারী সুন্দর এই বনময় পাহাড়ী পথটুকু।

"এটাই সবচেয়ে বড় ঘাট।" জনৈক সহযাত্রী সহসা আপনমনে বলে উঠলেন। তিনি পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'ঘাট' মানে গিরিপথ বা গিরিবর্ত্ম। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অংশ। যেখানেই এইরকম পথ আরম্ভ হচ্ছে, সেখানেই সাইনবোর্ড রয়েছে—'Ghat begins.' শুধু তাই নয়, পথ যেখানে একটু বেশি আঁকাবাঁকা কিংবা চড়াই-উৎরাই সেখানে মোটরচালকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী—'Nothing is more precious than life.' অভয়ারণ্য দেখার আমন্ত্রণও রয়েছে একাধিক বিজ্ঞাপনে। এখানে কাছাকাছি কোথাও বোধ হয় একটি জলপ্রপাত আছে। তাই পথের পাশে সাইনবোর্ড—'Panna waterfalls.'

জলপ্রপাত দেখা তো দূরের কথা, তার শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। কিংবা সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত আমাদের যন্ত্রযানের বিকট চিৎকারে হারিয়ে গিয়েছে।

আবার সাইনবোর্ড—'Ghat Ends.'

তার মানে দুর্গম পথ হল শেষ, শুরু হল সমতল। এমন অবশ্যি এর আগেও কয়েকবার হয়েছে। তারপরে আবার আরেকটি 'ঘাট' আরম্ভ হয়েছে।

এবারে বোধ করি আর তেমনটি হবে না। কারণ বন গেল ফুরিয়ে। দেখা দিল ক্ষেত-খামার ও ঘর-বাড়ি।

আমরা মাড্‌লা গ্রামে এলাম। পান্না থেকে সতেরো ও সাতনা থেকে ৮৬ কিলোমিটার এসেছি। এখান থেকে খাজুরাহো ৩০ কিলোমিটার।

মাড্‌লা গ্রাম ছাড়িয়ে এসেই নদী—'কেন্' নদী। এখানেই শেষ হল পান্না জেলা, নদীর ওপারে ছতরপুর।

নদী পার হয়ে এসে তাই বাস থামাতে হল। দিতে হল ছতরপুর জেলার প্রবেশকর বা চুঙ্গি।

শুনেছি এই পান্নাঘাট পর্বতশ্রেণী থেকে পাথর নিয়ে গিয়ে তৈরি করা হয়েছে খাজুরাহের মন্দির। এটিই খাজুরাহের নিকটতম পর্বতশ্রেণী। এখান থেকে খাজুরাহো প্রায় একত্রিশ কিলোমিটারের মতো। তখন যেমন এই পুল ছিল না, তেমনি ছিল না পথ। ছিল না বিদ্যুৎ ও যন্ত্রযান। ওপারের পাহাড় থেকে পাথর কেটে নৌকো কিংবা ভেলায় করে এপারে নিয়ে এসেছেন। তারপরে হাতি কিংবা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দুর্গম বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাথর নিয়ে গিয়েছেন খাজুরাহে। সেই পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছে রূপতীর্থ খাজুরাহো—বিশ্বের বিস্ময়।

চুঙ্গি দেওয়া হলে আবার বাস চলল এগিয়ে। এবারে প্রায়-সমতল পথ। পথের দুপাশে কোথাও ঝোপঝাড়, কোথাও বড় বড় গাছ, কোথাও বা ক্ষেত-খামার ও বাড়িঘর। বহুদূরে পাহাড়ের ধূসর রেখা।

আমরা সেকালের চান্দোরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু রাজ্যের কথা থাক, রাজধানীর কথা হোক—যে রাজধানী রূপান্তরিত হয়েছিল মন্দিরনগরীতে। বিশ্ববন্দিত সুসাহিত্যিক মুল্‌করাজ আনন্দ্ খাজুরাহের মন্দির সম্পর্কে লিখেছেন—'....the temples of Khajuraho are the development of those elements of architecture and sculpture of Gupta Golden age, ....in the new scheme, sculpture becomes dominant and the whole temple begins to look like a giant carving, reaching upto the heavens···in an incarnate array of the metaphysical story of creation, where there is no beginning and no end.'*

তাঁর মতে গুপ্তযুগের শিল্পকলার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেও খাজুরাহের মন্দির-নির্মাতাগণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। অপরূপ মূর্তি সম্বলিত এই মন্দিরগুলি ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে যেন স্বর্গকে স্পর্শ করেছে। মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর মূর্তির পাশাপাশি রয়েছে জন্তু-জানোয়ার এবং মানব-

* 'Homage to Khajuraho'.

মানবীর মূর্তি। মন্দির নির্মাণের কলাকৌশল থেকে যুদ্ধযাত্রা, দেবার্চনা থেকে মৈথুন—এক কথায় সমগ্র মানবজীবনকে তাঁরা মন্দিরগাত্রে মূর্ত করে রেখেছেন। ফলে দর্শনার্থীরা মন্দিরে গিয়ে জ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতেন, যে তত্ত্ব আদি ও অন্তহীন।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানে ভাস্কর্য স্থাপত্যকে জয় করেছে। কিন্তু এই বিজয় খাজুরাহে যেমন প্রকট, তেমনটি বোধ করি আর কোথাও নয়। খাজুরাহে মন্দির তৈরি করে মূর্তি দিয়ে সাজানো হয় নি, মূর্তি তৈরি করে মন্দির নির্মিত হয়েছে।

মন্দিরনগরী রূপে খাজুরাহের নির্বাচনটিও প্রশংসনীয়। চারিদিকে পাহাড, মাঝখানে বনময় প্রান্তর ও সবুজ সমতল। সমতলের বুক চিরে মন্দাক্রান্তা তালে বয়ে যাচ্ছে স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী। তারই তীরে গড়ে উঠেছিল জনপদ। সেই জনপদের উপকণ্ঠে রাজারা পঁচাশিটি পাথরের মন্দির নির্মাণ করেছেন। তাঁরা কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই এখানে অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির তৈরি করেন নি, সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষার দিক থেকে স্থানটির অবস্থানের কথাও চিন্তা করেছেন। খাজুরাহো সমতল কিন্তু তার চারিদিকে পাহাড়, তার ওপরে জায়গাটি উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে যাবার সংক্ষিপ্ত পথের ওপর অবস্থিত নয়। তাঁদের অনুমান সত্য হয়েছে। বহির্শত্রুর তেমন কোন বড আক্রমণ খাজুরাহে হয় নি।

তবু রাজারা নগরীর চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে খাজুরাহোকে আরও বেশি নিরাপদ করে তুলেছিলেন। প্রাসাদের মতো সে প্রাচীরও আজ অবলুপ্ত। আজ রয়েছে শুধু কয়েকটি মন্দির—মন্দিরনগরী খাজুরাহো।

আজকের খাজুরাহো এবং তার চারিপাশের বিস্তীর্ণ সমতল কেবল কাঁটা-গাছে-ছাওয়া উঁচুনিচু রুক্ষ প্রান্তর। অনেকেই প্রশ্ন করেন—এই অনুর্বর অঞ্চলে কেমন করে অমন ঐশ্বর্যময় অতগুলো মন্দির তৈরি হল?

ঐতিহাসিকগণ উত্তর দেন—তখন ভূপ্রকৃতি এমন ছিল না। বেশ বৃষ্টি হত এ অঞ্চলে। আর চান্দেলা রাজারা সারা রাজ্যে অসংখ্য দীঘি কাটিয়ে সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে তখন এ-রাজ্যে প্রচুর ফসল হত। উদ্বৃত্ত ফসলের আয় থেকেই নির্মিত হয়েছিল মন্দির।

চান্দেলা রাজারা প্রচুর প্রাণসম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাই স্বর্গের মন্দির নির্মাণের সময়ও তাঁরা মর্ত্যের জীবনকে বিস্মৃত হন নি। মন্দিরে যেমন ব্রাহ্মণ

পূজারী ছিলেন, তেমনি ছিল রূপসী দেবদাসী। মগধ মালব ও রাজপুতনা থেকে সুন্দরী ও লাস্যবতী যুবতীদের নিয়ে এসে দেবদাসী করা হত। সম্ভবতঃ শিল্পীরা মূর্তি নির্মাণের সময় তাদের 'মডেল' রূপে ব্যবহার করে থাকবেন।

এই প্রসঙ্গে মুল্‌করাজ আনন্দ্‌ বলেছেন—'the Gods and Surasundaris who cover the interiors and exteriors of the temples, were taken from real life and put there against stylised God and Goddesses of higher reaches.'

যেভাবেই এইসব মন্দির নির্মিত হয়ে থাক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার অনুকরণে সেকালের খাজুরাহে এক উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল।...

আমার ভাবনা থেমে যায়। বামিঠায় এসে বাস থেমেছে। তার মানে আমরা সাতনা থেকে ১০৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি। আর মাত্র ১১ কিলোমিটার।

তাহলেও রূপতীর্থে পৌছতে এখনও কিছু দেরি আছে। কারণ এখানে বেশ কিছুক্ষণ বাস দাঁড়াবে। অতএব নেমে আসি বাস থেকে।

দুটি পথের সঙ্গমে বামিঠা। মূল পথটি সাতনা থেকে এসে জেলা-সদর ছতরপুর চলে গিয়েছে। আর এখান থেকে শুরু হয়েছে রাজনগর ও মাহোবার পথ। সেই পথের ওপরেই খাজুরাহো।

একটি থানা, একটি গ্রামীন ব্যাংক, কয়েকটি চা-খাবার ও মুদি-মনোহারী দোকান এবং একটি ডাক্তারখানা ও গুটিকয়েক বাড়ি নিয়ে বামিঠা।

পথের পাশে সারি সারি গাছ। থানার পেছনে কয়েকটা সরকারী কোয়ার্টারস্, আর এখানে-ওখানে দরিদ্র নারী-পুরুষ ও রুগ্ন শিশুর জটলা। এ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই বামিঠায়। তবু চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বামিঠাকে বারে বারে দেখি—সে যে রূপতীর্থের প্রবেশতোরণ।

দুটি পথের সঙ্গমে এখান থেকে আরও অনেক জায়গার দূরত্ব দেওয়া রয়েছে। যেমন লেখা আছে—বারাণসী ১৩৯৮, রেওয়া ১৫৪, কানপুর ২৪৮, আগ্রা ৩৯০, ঝাঁসী ১৬৭, সাগর ১৮৭ ও মাহোবা ৮৩ কিলোমিটার।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে। চা-য়ের পয়সা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি এসে বাসে উঠি।

বাস চলতে শুরু করেছে। সেই ছায়াশীতল পিচঢালা মসৃণ পথ। বামিঠা

মিলিয়ে গেল, শুরু হল কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া উঁচু-নিচু রুক্ষ প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে পাহাড়ের ধূসর রেখা।

বাস ছুটে চলেছে। মাত্র মাইল ছ'য়েক পথ। মাত্র ছ'মাইল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌছে যাবো খাজুরাহে—রূপতীর্থ খাজুরাহো।

খাজুরাহো আজ বিশ্ববিখ্যাত। একালে খাজুরাহো নামেই সে সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু সেকালে?

এ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি মহারাজ ধঙ্গের শিলালিপিতে (১০০২খ্রীঃ) এই নগরীকে লেখা হয়েছে 'খর্জুরবাহক'। কিন্তু তার আগের (৯৬৯ খ্রীঃ) একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে 'খর্জুরবাটিকা', আবার 'পরমাল রাসো' গ্রন্থের রচয়িতা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছেন—'খাজ্জুরপুর'। পর্যটক আবু রিহন এবং ইবন বতুতা তাঁদের বর্ণনায় যথাক্রমে বলেছেন, 'খজুরাহঃ' এবং 'কজুরা'। অনেকে লিখেছেন 'কজরা' অথবা 'খজুরাহা'। তবে বুন্দেলখণ্ডের উচ্চারণ অনুযায়ী মনে হয় যে জায়গাটাকে খাজুরাহো বলাই উচিত হবে।

খাজুরাহো নামটি যে খেজুর গাছ থেকে এসেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেকালে নাকি এই রাজধানীর প্রধান তোরণ দুটি সোনার খেজুরগাছ দিয়ে সাজানো ছিল। কানিংহ্যাম অবশ্য বলেছেন—শুধু সেই সোনার খেজুরগাছের জন্যই খাজুরাহো নাম হয় নি, সেকালে সত্যি সত্যি এ অঞ্চলে প্রচুর খেজুরগাছ জন্মাতো। আর তাই চান্দেলা রাজবংশের সেই সমৃদ্ধ রাজধানীর নাম হয়েছিল খাজুরাহো।

## ॥ পাঁচ ॥

বাস থেকে নেমে আসতেই ওরা ঘিরে ধরে আমাদের। যথারীতি নিজ নিজ হোটেলে থাকা এবং খাওয়ার সুখ-সুবিধা সম্পর্কে বক্তৃতা শুরু করে দেয়।

গতবারেও খাজুরাহে পদার্পণ করার পরে এই একই নাটক অভিনীত হয়েছিল। অতএব বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সবিনয়ে তাঁদের আতিথেয়তা প্রত্যাখ্যান করি। বলি, "ট্যুরিস্ট-বাংলোয় চিঠি লিখেছি।"

"লিখলেও ঘর পাবেন না সেখানে।" জনৈক হোটেল-এজেন্ট জজসাহেবী ভঙ্গীতে রায় দান করে।

আরেকজন যোগ করে, "ঘর পেলেও সেখানে যেঅনেক অসুবিধে আছে, স্যার।"

সহাস্যে প্রশ্ন করি, "কি রকম ?"

"একে তো ট্যুরিস্ট-বাংলো বহুদূর। প্রতিবার যাতায়াতের জন্য আপনাদের চারজনের অন্তত আট টাকা করে রিক্সাভাড়া ও ঘণ্টাখানেক করে সময় লেগে যাবে। তার ওপর ওখানে খাওয়া-দাওয়ার খরচও বেশি।"

আমি যে গতবছর এখানে এসেছি, এ-কথাটি ওদের জানার কথা নয়। তাই সে রিক্সাভাড়া ও সময় দুটোকে দ্বিগুণ করে নিয়েছে। তবু প্রতিবাদ করে সময় নষ্ট করা বৃথা। শুধু বলি, "চিঠি যখন লিখেছি, একবার গিয়ে দেখতে চাই। ঘর না পেলে তাহলে তো ফিরে আসতেই হবে আপনাদের কোন হোটেলে।"

আমরা যাতে ঘর না পাই, সেজন্য ওরা নিশ্চয়ই মনে মনে মা-লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করে। এবং তারপরেও নানা কথা বলে আমাদের বিরত করার চেষ্টা শুরু করে। কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে রিক্সায় উঠে বসি।

খাজুরাহো বাস স্ট্যাণ্ডটি বিশেষ বড় নয়। বাস স্ট্যাণ্ডের দু-দিকে দোকান, একদিকে মিউজিয়াম আরেকদিকে রাজপথ। পথের পাশেও দোকানপাট। পুতুল ও চায়ের দোকানই বেশি। মুদি-মনোহারী আর পানের দোকানও রয়েছে। আর রয়েছে কয়েকটি থাকা-খাওয়ার হোটেল—যাদের এজেন্ট্রা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

বাঁদিকে মিউজিয়াম, ডানদিকে থানা ও বাজার পেরিয়ে বড় রাস্তায় এলাম—বামিঠা ও মাহোবার পথে। আমরা বাঁদিক থেকে এসেছি। এবারে রিক্সা এগিয়ে চলল ডানদিকে অর্থাৎ মাহোবার দিকে। আমরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছি।

বাঁদিকে বাজার, ডানদিকে মন্দির এলাকা—Western group of Temples. পশ্চিমের এই মন্দিরগোষ্ঠীতে রয়েছে—মাতঙ্গেশ্বর, চৌষট্টি যোগিনী, লালুগুঁয়া মহাদেব, বরাহ, লক্ষ্মণ, বিশ্বনাথ, নন্দী, পার্বতী, চিত্রগুপ্ত, জগদম্বা, ও কাণ্ডারিয়া-মহাদেব মন্দির। এরই কয়েকটি মন্দির খাজুরাহোকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে। সুতরাং এরাই খাজুরাহের প্রধান আকর্ষণ। এখানেই গড়ে উঠেছে বাজার বাস স্ট্যাণ্ড ও হোটেল। আর তাই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ( Archaeological Survey of India ) কেবল এই কয়টি মন্দিরকেই তারকাঁটা দিয়ে ঘিরে টিকেটের ব্যবস্থা করেছেন। জনপ্রতি প্রবেশমূল্য পঞ্চাশ পয়সা। শুক্রবার কোন প্রবেশমূল্য লাগে না। আরে, তাই তো! আজও যে শুক্রবার। তাহলে তো আসতেই হবে একবার।

আমার সহযাত্রীরা রিক্সায় বসে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মন্দিরগুলোর দিকে—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

আমি ওদের আশ্বস্ত করি, "ঘর ঠিক করে, চা খেয়ে আজই আসব একবার। নিজেরা দেখে নেব যতটা পারি। কাল আবার গাইডের সঙ্গে দেখব।"

ওরা খুশি হয়, রিক্সা এগিয়ে চলেছে। ডানদিকে 'হোটেল রাজ'—খাজুরাহের সব চেয়ে জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ। অবস্থানটি চমৎকার—বিশ্বনাথ মন্দিরের সোজাসুজি পথের ধারে একটা বড় গাছের নিচে। মুক্ত আকাশতলে গাছের ছায়ায় চেয়ার-টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে।

জনৈকা বিগতযৌবন অবিবাহিত আধুনিকা এর মালিক। তাঁর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি 'চেইন-স্মোকার', কিন্তু কখনই সিগারেট স্পর্শ করেন না—সর্বদা বিড়ি সেবন করেন।

যাক্ গে, আমাদের রিক্সা এগিয়ে চলেছে। 'হোটেল রাজ'-এর সঙ্গেই 'Foreign Liquoı Shop', তারপরেই ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস। এঁরা রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ সকাল দশটা ও বিকেল সাড়ে তিনটায় পশ্চিম-মন্দিরগোষ্ঠীতে দুটি 'Conducted Tour' পরিচালনা করেন। জনপ্রতি মাত্র দু'টাকা করে গাইড-ফি। খাজুরাহে 'প্রাইভেট গাইড-ফি' বড়ই বেশি। কেবল এই ক'টি মন্দিরের জন্যই চারজনের একটি দলকে পঁচিশ টাকা দিতে হয়। একজন হলেও একই দক্ষিণা।

ট্যুরিস্ট অফিসের কাছেই কাঁটাতারের বেড়া অর্থাৎ মন্দির-এলাকা শেষ হয়ে গেল। লোকালয়ও শেষ হল এখানে। এখন পথের বাঁদিকে বিদ্যুৎ পর্ষদের সাব-স্টেশন ও ডানদিকে একটি দীঘি। দীঘির পরে রাহিল জনতা হোটেল অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট-ডরমিটরীতে যাবার মোটরপথ।

আমরা এগিয়ে চলেছি। পথের দু-পাশেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দূরে পাহাড়ের ধূসর রেখা। মিনিট কয়েক বাদেই বাঁদিকে ভারত সরকারের (I. T. D. C.) খাজুরাহো হোটেল। ডানদিকে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সার্কিট-হাউস এবং ট্যুরিস্ট-বাংলো।

বড় বড় গোড়া-বাঁধানো গাছে-ছাওয়া শান্ত সুন্দর বাংলো। গেট থেকে বাঁধানো পথ ভেতরে প্রসারিত। পথের পাশে পাশে বাগান—ফুলের মেলা। নানা রঙের নানা রকমের ফুল।

অফিসের সামনে এসে রিক্সা থামল। অফিসের দু-পাশে দু-খানি করে

চারখানি 'স্যুইট' ও পরের বাড়িটিতে ছ'টি-স্যুইট। চারখানি খাটের এই ছ'টি স্যুইট আছে এখানে। প্রতি স্যুইটের দৈনিক ভাড়া তেত্রিশ টাকা। গতবছর বিশ টাকায় থেকে গিয়েছি।

অফিসের পেছনেই 'ডাইনিং হল' ও 'কিচেন', এখানে চা, 'ব্রেক্‌-ফাস্ট', 'লাঞ্চ', ও 'ডিনার'—সবই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় আমিষ, নিরামিষ ও 'ইংলিশ-ডিস।' চা প্রতি কাপ পঁচাত্তর পয়সা, পরোটা ও তরকারির ব্রেক্‌-ফাস্ট্‌ ছ'টাকা, আর আমিষ ও নিরামিষ খাবার যথাক্রমে সাত ও পাঁচ টাকা। বেশ ভাল খাবার।

সাহেবীখানার দামও সাহেবী, জনপ্রতি চোদ্দ টাকা। অবশ্য এখানকার বড় বড় হোটেলের তুলনায় কিছুই নয়। বড় হোটেল বলতে—খাজুরাহো হোটেল, হোটেল চান্দেলা ও টেম্পল হোটেল। সেখানে শুধু একখানি ডাবল-বেড রুমের দৈনিক ভাড়া পঁচাত্তর থেকে দু'শো টাকা।

সুতরাং সে-ভাবনা থাক। এই ট্যুরিস্ট-বাংলোর সঙ্গেই সার্কিট-হাউস। মাঝখানে কেবল কয়েকটি বড় গাছ ও ফুলবাগান, কোন দেওয়াল নেই। দুই-খাটের সাতখানি ঘর আছে। ছতরপুরের জেলা শাসকের অফিসে চিঠি লিখে ঘর 'রিজার্ভ' করাতে হয়।

আমার মতো সাধারণ পর্যটকদের জন্য রাজ্য পর্যটন বিভাগ এখনি আরেকটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন—রাহিল জনতা হোটেল। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে —মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে খুবই কাছে। কিন্তু রিক্সায় যেতে হলে অনেকটা ঘুরতে হবে। ওখানে যেমন দৈনিক তেত্রিশ টাকা ভাড়ায় কয়েকখানি ডাবল-বেড রুম আছে, তেমনি আছে বিশখানি খাটের চারটি ডরমিটরী। জনপ্রতি দৈনিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা। খাওয়ার ব্যবস্থা এখানের মতই। ওখানে একশ'জন লোক থাকতে পারে।

রিক্সা থেকে নেমে অফিসে উঠে আসি। ম্যানেজার টি. এল. সোনাওয়ানে দেখছি বয়সে তরুণ। পরিচয় দিতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে করমর্দন করেন। বলেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি, ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি—পাশের বাড়িতে ছ'নম্বর স্যুইট।"

"ছ'নম্বর!" আমি বিস্মিত।

"আজ্ঞে হ্যাঁ!" ম্যানেজার বিচলিত। বলেন, "আপনার কি অসুবিধে হবে? কিন্তু ওটাই যে আমার সব চেয়ে ভাল স্যুইট, একেবারে আলাদা।"

"না না, অসুবিধে হবে কেন ? আমি জানি ওটা খুবই ভাল ঘর। কারণ গতবছর এখানে এসেও আমি ঐ ঘরে ছিলাম। তাই একটু অবাক হচ্ছি আর কি।"

ম্যানেজার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। সহাস্যে বলেন, "আমার কিন্তু সেটা জানা ছিল না স্যার! ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়।"

"আরও আছে", আমি বলি, "গতবছরও এই ১২ই জানুয়ারী আমি ঐ ছ'নম্বর স্যুইটে ছিলাম।"

"সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার!" ম্যানেজার মন্তব্য করেন।

খাতায় নাম-ধাম লেখা হলে বেয়ারার সঙ্গে বেরিয়ে আসি অফিস থেকে। সে ঘর খুলে দেয়—সেই ঘর। ঠিক এক বছর পরে আমি আবার ফিরে এসেছি এই ঘরে—এসেছি রূপতীর্থ খাজুরাহে।

সাজানো-গোছানো বেশ বড় ঘর। মেঝেতে দড়ির কার্পেট, দু'দিকে বড় বড় কাচের জানলা। একদিকে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে রহিল জনতা হোটেল আর দূরে পাহাড়ের ধূসর রেখা। জনতা হোটেলটিও ছবির মতো সুন্দর লাগছে এখান থেকে। আরেকদিকে সার্কিট-হাউস ও বাংলোর বাগান। জানলা-দরজায় সুদৃশ্য পর্দা। ঘরের একপাশে চারখানি ডানলোপিলো দেওয়া আধুনিক খাট। খাটের পাশে পাশে বেড-সাইড টেবল ও রিডিং লাইট। বিছানায় ধবধবে চাদর বালিশ ও দামী কম্বল। ঘরে চারটি বড় দেওয়াল-আলমারী। তিনটি বড় আলো, একখানি করে ড্রেসিং ও সেণ্টার টেব্‌ল এবং কয়েকখানি চেয়ার।

"এ যে দেখছি মশাই গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেল!" ঘরে ঢুকেই সানন্দে সৌরীনবাবু বলে ওঠেন।

কথাটা ভদ্রলোক খুব বাড়িয়ে বলেন নি। তবু বলি, "এখানে বিদেশী ট্যুরিস্ট খুব বেশী আসেন। তাই হয়তো একটু ছিমছাম করতে হয়েছে। তা ছাড়া ভাড়াটাও তো একেবারে কম নয়, চারজনের জন্য দৈনিক তেত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা ঘোষদা, খাজুরাহের 'সিজন-টাইম' কখন ?" রণজিৎ প্রশ্ন করে।

"এখন চলছে।"

"মানে ?"

"অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। সারা বছর এখানে যত পর্যটক আসেন, তার শতকরা পঁচাত্তর জন আসেন এই সাত মাসে। তবে বাকি পাঁচ মাসও প্রায় সব সময়েই এখানে কিছু কিছু পর্যটক এসে থাকেন।"

"বর্ষাকালে বোধ হয় কেউ বড় একটা আসেন না ?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

"এখানে বৃষ্টি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বর্ষা মোটেই ক্লান্তিকর নয়, বরং বৃষ্টি হলে গরম কমে গিয়ে আবহাওয়া আরামপ্রদ হয়ে ওঠে। কাজেই ছাতা সঙ্গে করে কিছু পর্যটক বর্ষাকালেও খাজুরাহো আসেন।"

"তাহলে কোন সময়টা সব চেয়ে খারাপ এখানে ?"

"গ্রীষ্মকাল, তার মানে মে-জুন মাস। তখন এখানে ঘোরাঘুরি করা সত্যি কষ্টকর।"

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। রণজিৎ পট থেকে কাপে ঢালে, পরিবেশন করে।

চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে গৌতম বলে, "গতবছর (১৯৭৮) এপ্রিল-মে মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'বিশ্বরূপের প্রাঙ্গনে' এবং অন্য দুটি নামে শ্রীসমরেশ বসুর তিনটি লেখা পড়েছিলাম। কাণ্ডারিয়া-মহাদেব মন্দিরে এক নৃত্যের মহোৎসব আয়োজিত হয়েছিল। সে উৎসব কখন হয় ?"

"গত বছর ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়েছিল। কথা ছিল সাত দিন ধরে চলবে। কিন্তু শেষদিকে বৃষ্টি হওয়ায় উৎসব দশ দিন স্থায়ী হয়।"

"কারা কারা এসেছিলেন ?" সৌরীনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সবার নাম জানা নেই আমার।... তবু উত্তর দিই, "বিরজু মহারাজ, কবিতা শ্রীধরণী, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী ও কুমকুম প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পীগণ। এসেছেন মারিয়া, গোন্দ আর বৈগা প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী শিল্পীগণ।"

রণজিৎ প্রশ্ন করে, "এ বছর সে-উৎসব হবে না ঘোষদা ?"

"কেন, তুই আসবি নাকি ?"

"না, না। সেজন্য নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"হবে। ১২ই থেকে ১৮ই মার্চ।" একবার থেমে আবার বলি, "কিন্তু আর গল্প নয়। হাত-পা ধুয়ে জামা-কাপড় পালটে এবারে বেরিয়ে পড়া যাক। সন্ধ্যে হতে আর বড় জোর ঘণ্টা-দুয়েক বাকি। পশ্চিমের মন্দিরগুলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে। তাড়াতাড়ি না বের হলে সব মন্দির প্রদক্ষিণ করা যাবে না।"

বেরিয়ে আসি বাংলো থেকে। রিক্সা রয়েছে। কিন্তু থাক, হেঁটেই যাওয়া যাক। কতই বা দূর ? খুব বেশি হলে এক কিলোমিটার। দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

চলতে চলতে গৌতম জিজ্ঞেস করে, "খাজুরাহের কাছাকাছি আর কোন দর্শনীয় স্থান আছে ?"

"আছে বৈকি, অনেকগুলো জায়গা আছে।"

"যেমন ?"

"অনুমতি না নিয়েই সোজাসুজি চলে যাওয়া যায় বেণীসাগর ও রঙ্গুয়া বাঁধ—এখান থেকে ১১ ও ২৫ কিলোমিটার। যাওয়া যায় গাঙ্গু বাঁধ ও অভয়ারণ্য, রাণে জলপ্রপাত এবং রাজগড় প্রাসাদ ও অজয়গড় দুর্গ দেখতে—দূরত্ব যথাক্রমে ৩৮, ১৯, ২৪ ও ৮০ কিলোমিটার। এ ছাড়া ফেরার পথে পান্না যাবার সময় দেখতে পারো পাণ্ডব জলপ্রপাত, এখান থেকে ৪৭ কিলোমিটার।"

আমি থামতেই রণজিৎ প্রশ্ন করে, "কোথায় যেতে হলে অনুমতি নিতে হয় ?"

"যদি মাঝগোয়াঁ সরকারী হীরার খনি দেখতে চাস, তাহলে তোকে অনুমতি নিতে হবে।"

"হীরার খনি ?"

"হ্যাঁ।"

"কতদূর এখান থেকে ?"

"পঞ্চাশ কিলোমিটার।"

"বাস যায় ? সেখানে থাকার জায়গা আছে ?"

"আমাদের বাংলোতেই মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টরের অফিস, কাল সেখানে সব খবর পেয়ে যাবি।"

রণজিৎ আবার কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেরে ওঠে না। হঠাৎ নজর পড়ে ওদের—সাইকেল আরোহীদের দিকে। সাইকেল দেখে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ এখানে সাইকেলই পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। রণজিতের সাইকেল-প্রীতিও তার নির্বাক হয়ে যাবার কারণ নয়। সাইকেলের আরোহীরাই তাকে অবাক করেছে। তারা খাঁটি সাহেব এবং মেম, নিঃসন্দেহে বিদেশী ট্যুরিস্ট। ওঁরা নানা ধরণের ছোট-বড় মোটরগাড়ি নিয়ে এদেশে আসেন। বাংলোর অঙ্গনে তেমন দু'খানি গাড়ি দেখেও এলাম। কিন্তু সাইকেল নিয়ে কেউ বিশ্বপরিক্রমায় বের হয়েছেন বলে আজকাল তো বড় একটা শোনা যায় না। তাহলে এঁরা সাইকেল পেলেন কোথায় ?

প্রশ্নটা গতবার আমার মনেও দেখা দিয়েছিল। তাই খোঁজখবর নিয়ে

জেনেছিলাম। এখানে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। রিক্সা ও টাঙ্গা ভাড়া অত্যন্ত বেশি বলে বহু পর্যটক সাইকেল ভাড়া নিয়ে দূরের মন্দিরগুলো দেখে আসেন।

কথাটা বলতেই রণজিৎ লুব্ধ হয়ে ওঠে। বলে, "আমরাও তাহলে কাল সাইকেল ভাড়া করে মন্দির দেখতে যাবো।"

খুবই স্বাভাবিক। সে সুদক্ষ সাইকেল চালক। সাইকেলে চড়ে কলকাতা থেকে দিল্লী গিয়েছে।

কিন্তু আমরা তার পরামর্শ মেনে নিতে পারি না। সৌরীনবাবু বলেন, "না রে ভাই, এই বুড়ো বয়সে চড়াই-উৎরাই পথে সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে ঠ্যাং ভাঙতে পারব না।"

অতএব রণজিৎ আবার চুপ হয়ে যায়। তার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারছি। সাইকেল আরোহণের এমন একটা অপূর্ব সুযোগ মাঠে মারা গেল।

বেচারা রণজিৎ নীরব বলেই হয়তো আমরাও নীরবে পথ চলেছি। ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। মন্দিরগুলো বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওদের জন্যই এখানে আসা। এখন ওদের কাছেই চলেছি। আগেই বলেছি, এটি পশ্চিমের মন্দিরগোষ্ঠী খাজুরাহের প্রধান দর্শনীয়। পূব এবং দক্ষিণে আরও দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। সেগুলো বেশ দূরে, তাই কাল দেখব।

সহসা গৌতম নীরবতার অবসান ঘটায়। বলে, "খাজুরাহে তো হিন্দু এবং জৈন দু ধর্মেরই মন্দির আছে?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "বৌদ্ধ মন্দিরও নাকি ছিল এক সময়ে। শুধু তাই নয়, এখানে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব সব সম্প্রদায়েরই মন্দির আছে। আরও উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক মন্দিরে সব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেব-দেবীদের মূর্তি রয়েছে।"

"তার মানে খাজুরাহে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল!" সৌরীনবাবু মন্তব্য করেন, "এ থেকে বোধ হয় আমরা দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার একটা মোটামুটি রূপ অনুমান করতে পারি?"

আমি মাথা নাড়ি। বলি, "আরও একটা জিনিস আপনারা দেখতে পাবেন —বিভিন্ন ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়ের মন্দির হলেও তাদের স্থাপত্যকলা মোটামুটি একই রকম। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পণ্ডিত কাণ্ডসান বলেছেন,...'they must

have erected in an age of extreme toleration when any rivalry that existed must only have been among the architects in trying who could produce the most beautiful and most exquisitely adorned building.'*

হোটেল রাজ এসে গিয়েছে। আর কয়েক পা এগিয়েই টিকিট ঘর, পাশেই প্রবেশ পথ। এইবেলা আমার সহযাত্রীদের আরও কয়েকটা কথা বলে দেওয়া দরকার, তাহলে মন্দির দর্শন করতে খানিকটা সুবিধে হবে ওদের। তাই তাড়াতাড়ি বলতে থাকি, "এই মূর্তিময় মন্দিরগুলো থেকে সেকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অনেকখানি জানতে পারবে। এইসব মন্দিরের অসংখ্য মূর্তির মধ্যে যেমন দেব-দেবীর মূর্তি পাবে, তেমনি পাবে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি। দেখবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, যুবকরা যুদ্ধে যাচ্ছে, শিকার করছে, চাষ ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছে। মেয়েরা সংসার ও সমাজের নানা কাজকর্ম করছে। ঐ সব মূর্তি থেকে সেকালের সমাজে নারীর স্থান স্থির করতে পারবে। দেখতে পাবে—পোশাক ও অলঙ্কারের ধরণ, চুল দাড়িগোঁফের বাহার, প্রসাধন সামগ্রী, নাচ-গান ছবি আঁকা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, অস্ত্র-শস্ত্র আসবাব ও বাসনপত্রের কথা। জানতে পারবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে এবং কামশাস্ত্র সম্পর্কে সেকালের মানুষদের মনোভাব।"

## ॥ ছয় ॥

সকালে ঘুম ভেঙেছে ঠিক সময়ে, তৈরি হতেও সময় লাগে নি, তবু দেরি হয়ে গেল। দেরি হল প্রাতরাশের জন্য। সাতটার আগে বেড-টি ও আটটার আগে ব্রেক-ফাস্ট পাওয়া যায় না ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। কি করবে? কর্মচারীরা যে সবাই রাতের কাজ সেরে ঘরে চলে যায়। এই শীতে বাড়ি থেকে এসে উনুন ধরিয়ে চা বানাতে সাতটা তো বেজে যাবেই!

খাজুরাহে পাঞ্জাবী মাদ্রাজী ও ইংরেজী রেস্তোরাঁ রয়েছে। তবু আমরা এতক্ষণ ব্রেক-ফাস্টের জন্য এখানে বসে রয়েছি, কারণ সে-সব রেস্তোরাঁয় হয়

* 'A History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II by James Ferguson.

পকেট-কাটার অঢেল ব্যবস্থা, নয়তো খাবার ভাল নয়। গতবছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানি খাজুরাহে আমাদের মতো মানুষদের থাকা ও খাওয়ার সব চেয়ে ভাল জায়গা এই ট্যুরিস্ট-বাংলো অথবা রাহিল জনতা হোটেল।

তাই এতক্ষণ আমরা চাতকের মতো ব্রেক্-ফাস্টের প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। এইমাত্র সে প্রতীক্ষার অবসান হল—গরম গরম পরোটা ও আলুর তরকারী এবং সুস্বাদু চা পাওয়া গেল।

খেয়ে নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়ি। সেই পথ। যে-পথে কাল বাস স্ট্যাণ্ড থেকে এখানে এসেছি, আর এখান থেকে মন্দিরে গিয়েছি। সকালের সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পথে, তবু বেশ শীত-শীত করছে। তাহলেও কেউ 'কোট' নিই নি। একটু বাদেই গরম লাগবে, তখন ওটা বোঝায় পরিণত হবে।

বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। রিক্সা ও টাঙ্গাওয়ালারা ঘেরাও করল আমাদের। বললাম—চতুর্ভুজ দেখিয়ে দুলাদেও মন্দিরের কাছে ছেড়ে দিতে হবে।

—কেন, ঈস্টার্ন গ্রুপ্ দেখবেন না?

—দেখব, পায়ে হেঁটে।

—খুব কষ্ট হবে কিন্তু!

—তা হোক গে। তোমারা বল, চতুর্ভুজ আর দুলাদেও যেতে কত টাকা চাও?

—দু' রিক্সা ষোল টাকা।

—আর এক টাঙ্গা?

—বারো টাকা।

অতএব টাঙ্গার সওয়ার হওয়া গেল। টাঙ্গা চলল এগিয়ে। এখন সকাল ন'টা।

গতকাল আমাদের বাস যে-পথে খাজুরাহো এসেছিল, আমরা সেই পথ ধরেই বামিঠার দিকে চলেছি। না, ফিরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি খাজুরাহের দূরতম দেবালয় চতুর্ভুজ মন্দির দর্শন করতে।

মিউজিয়াম ছাড়িয়েই পথের ডানদিকে সুবিশাল জলাশয়—শিবসাগর, আর বাঁদিকে ভারী সুন্দর একটি আধুনিক পার্ক। চমৎকার ছায়াশীতল। 'পিকনিক্ স্পট' বলা যেতে পারে। পার্কের পাশ দিয়ে খাজুরাহো গ্রামের পথ—ইটের হলেও বেশ চওড়া, মোটর চলাচল করতে পারে। এটি দুলাদেও এবং জৈন মন্দিরে যাবার পথও বটে। ১৯৬২ সালে ডাঃ অজিত ব্যানার্জী যখন এখানে

এসেছিলেন, তখন বাস স্ট্যাণ্ড ছিল এই পথের শেষে—জৈন মন্দিরের কাছে। পরবর্তীকালে মূল রাস্তার পাশে বর্তমান স্থানে বাস স্ট্যাণ্ড সরিয়ে আনা হয়েছে।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে এক কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তার বাঁদিকে 'Hotel Chandella'—অতি আধুনিক বিলাসবহুল পান্থশালা। খাজুরাহো হোটেল-এর মতই ব্যয়বহুল। সেটি সরকারী, এটি বে-সরকারী। কিন্তু দুটিই সাতিশয় সৌভাগ্যবানদের শান্তিনিবাস।

অতএব আমাদের মতো মানুষের ওদিকে নজর দিয়ে বৃথাই কষ্ট পাওয়া। তাই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকাই। কাছের ঝোপঝাড় আর দূরের পাহাড় দেখতে থাকি। টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে।

একটু এগিয়েই পথের ডানদিকে 'Hotel Temple', চান্দেলা কিংবা খাজুরাহো হোটেলের মতো বিশাল ও ব্যয়বহুল না হলেও আমাদের জন্য নয়। একখানি ডাবল বেড-রুমের দৈনিক ভাড়া প্রায় পঁচাত্তর টাকা। আবার চোখ ফিরিয়ে নিই, সামনে তাকাই।

ছায়াশীতল পথ। পথের পাশে গাছের সারি—আম বকুল বট অশ্বত্থ নিম মহুয়া আরও নানা জানা-অজানা গাছ। এখানেই রয়েছে সেই স্বাগত-লিপি—পথের ডানদিকে বিরাট এক সাইনবোর্ড। একপাশে লেখা—'WELCOME', 'WILL KOMEN', 'BIEN VENU' এবং হিন্দীতে 'স্বাগতম'। আরেক-পাশে লেখা রয়েছে—'HAPPY JOURNEY', 'BON VOYAGE' এবং 'GLUCKICH REISE'. প্রথমাংশ খাজুরাহো আসার সময়ে নজরে পড়ে, আর দ্বিতীয়াংশ ফিরে যাবার সময়।

খাজুরাহে বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা খুবই বেশি। তাই তার প্রবেশ পথে এই সার্বজনীন স্বাগত-লিপি। ইংরেজী ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষী গাইড পাওয়া যায় এখানে। এমন কি বিদেশী পর্যটকদের প্রয়োজনে এখানে একটি বিমানবন্দর পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দুবার করে একখানি বোয়িং-৭৩৭ আসা-যাওয়া করে। বহু ব্যস্ত পর্যটক সকালের বিমানে অবতরণ করে মন্দির দেখে আবার বিকেলের বিমানে খাজুরাহো পরিত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সামান্যই দেখতে পারেন, কারণ খাজুরাহো ব্যস্ত পর্যটকের জন্য নয়। রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে অরূপ-রতন পেতে হলে অবসর অপরিহার্য।

আমরা এখন বিমানবন্দরের দিকেই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু বিমানবন্দরের

কথা নয়, বিদেশী পর্যটকদের প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। তাঁদের জন্য কেবল এখানে হোটেল আর গাইড নেই। এখানকার ট্যাক্সি-ড্রাইভার ও রিক্সাওয়ালারা পর্যন্ত ইংরেজীর সঙ্গে বেশ কিছু ফরাসী ও জার্মান শব্দ শিখে নিয়েছে। এবং প্রয়োজনে তারা সেগুলো যথাযথ প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দেড় কিলোমিটার এসেছি। এখানে একখানি সাইনবোর্ডে তীর এঁকে বাঁদিকে চতুর্ভুজ মন্দিরের পথনির্দেশ করা হয়েছে। দূরত্ব এখান থেকে ২ কিলোমিটার।

এবারে সেই সুরকির পথ দিয়ে টাঙ্গা পূবদিকে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে অবশ্য পারছে না তেমন। চড়াই-উৎরাই সংকীর্ণ ও অসমতল পথ। নাম—চতুর্ভুর্জ টেম্পল রোড।

পথের দু-দিকেই উঁচু-নিচু রুক্ষ প্রান্তর। কাঁটাবন আর ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে বড় গাছও রয়েছে। বাঁদিকে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা, ডানদিকে বিমানবন্দর। জানি বলেই বলছি, নইলে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

খানিকটা এসে একটা ছোট নদী। টাঙ্গাওয়ালা জানায়—জাটকারী নদী; দূরে জাটকারী গাঁও দেখা যাচ্ছে।

সিমেন্টের পুল পেরিয়ে আমরা নদীর অপর পারে এলাম। এখানে আরেকটি ইংরেজী সাইনবোর্ড—চতুর্ভুর্জ মন্দির ১.৫০ কিঃ মিঃ। আর এখান থেকেই শুরু হল মাটির পথ। তেমনি চড়াই-উৎরাই।

বাঁদিকে একটা ইটখোলা। চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইটখোলা হয়তো ঠিক কারখানা নয়, তবু এই ধোঁয়ার ভেতরে আমি 'ইণ্ডাস্ট্রির' গন্ধ পাচ্ছি। এবং রূপতীর্থ খাজুরাহে গন্ধটাকে বড়ই বেমানান ঠেকছে।

একটা ছোট খাল পেরিয়ে আমরা আরও নিচে নেমে চলেছি। সামনে চড়াই পথ দেখা যাচ্ছে। আবার ওপরে উঠতে হবে।

টাঙ্গাওয়ালা বলে—খাল নয়, নদী—খুড়ার নদী। ঐ দেখুন, বাঁদিকে জাটকারী গ্রাম, আর ডানদিকে দেখা যাচ্ছে চতুর্ভুর্জ মন্দির।

তাড়াতাড়ি ডানদিকে তাকাই। টাঙ্গাওয়ালা ঠিকই বলেছে—চতুর্ভুর্জ মন্দির স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রায় এসে পড়েছি।

পথের পাশে একপাল গরু-মোষ চড়ছে। অর্ধউলঙ্গ কয়েকটা রোগা ছেলে-

মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। সহসা তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানি বড় বিদেশী গাড়ি এদিকে আসছে। আরোহীরা চতুর্ভুজ মন্দির দেখে ফিরে যাচ্ছেন।

গাড়িটা কাছে এলো। আমরা একপাশে সরে জায়গা করে দিলাম। ছেলেমেয়েগুলো নীরব হয়ে গিয়েছে, তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে গাড়িটার দিকে। কি ভাবছে, কে জানে?"

আমি ভাবছি অন্য কথা—হোটেল চান্দেলার পুরু কার্পেট পাতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরাগুলো কতই বা দূর এখান থেকে? খাজুরাহের সমৃদ্ধি খাজুরাহো কিংবা জাটকারী গাঁয়ের মানুষগুলোর জীবনে সমৃদ্ধি আনতে পারে নি। আজও তাঁরা হারিয়ে যাওয়া অতীতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই ওরা কেবল দূর থেকে আমাদের দেখে, কখনও কাছে আসতে সাহসী হয় না।

"ঘোষদা, দেখুন ওরা কেমন একখানি সাইকেল ভাড়া নিয়ে দুজনে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে!" সহসা রণজিৎ বলে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই সাইকেল আরোহীদের দিকে তারই প্রথম নজর পড়েছে।

আমরাও তাদের দেখি। একজন দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রংটি টকটকে লাল। উস্কোখুস্কো বড় বড় চুল, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। পরনে পাতলা কাপড়ের ঢোলা প্যাণ্ট, গায়ে ফুলহাতার সার্ট ও হাফহাতার সোয়েটার। সে সাইকেল চালাচ্ছে। আর পেছনে বসে আছে একটি ছোটখাটো ভারী সুশ্রী যুবতী। মুখখানি যেমন কচি, তেমনি মমতা মাখানো। তার গায়ের রং অত ফর্সা নয়, তাই বোধ করি তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েটির পরনে কালো গরম কাপড়ের প্যাণ্ট ও ফুলহাতার সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল শু', কাঁধে দুটি ক্যামেরা ও একটি লেডিজ ব্যাগ।

চড়াই-উৎরাই মাটির পথ। সাইকেল চালানো খুব সহজ নয়। তাই ওরা ধীরে ধীরে পথ চলেছিল। আমাদের টাঙ্গা কাছে আসতেই যুবকটি তাড়াতাড়ি সাইকেল পথের পাশে নিয়ে যায়। যুবতীটি নেমে পড়ে। তার কাঁধে হাত দিয়ে যুবক সাইকেল থামায়।

ওদের দিকে তাকাই। ওরা দুজনেই মুচকি হাসে। অর্থ সুস্পষ্ট—আপনারা এগিয়ে যান, আমরা পেছনে আসছি।

আমাদের টাঙ্গা এগিয়ে আসে। মেয়েটির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ছেলেটি

হ্যাণ্ডেল ধরে। মেয়েটি সাইকেল সমেত ছেলেটিকে একটু ধাক্কা দিয়ে নিজে পেছনে উঠে বসে। সাইকেল চলতে শুরু করে। ওরা আমাদের অনুসরণ করছে। ওরাও নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ মন্দির দেখতে আসছে।

"ওঁরা রিক্সা নেন নি কেন?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

"পয়সার অভাবে।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সৌরীনবাবু উত্তর দেন।

"সাহেবদের পয়সার অভাব!" গৌতম বিস্মিত।

রণজিৎ বলে, "ওরা সাইকেল চড়বে বলে রিক্সা নেয় নি।"

এবারে আমি কথা বলি, "শ্বেতাঙ্গ পর্যটকরা সবাই সাহেব হলেও ধনী নয়। ওঁদের দেশের মধ্যবিত্ত মানুষরাও বিশ্ব-পরিক্রমায় বের হন। কারণ ওঁদের কাছে—'Travelling is a part of education?' এবং সারাজীবনই জ্ঞানলাভের সময়। তাই বহু বিদেশী পর্যটক প্রভূত কষ্ট করে ভ্রমণ করে থাকেন এবং তাঁরা কখনই অপব্যয় করেন না। যেখানে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে কেন ওঁরা রিক্সা নেবেন?"

"আমরা কিন্তু নিয়েছি।" রণজিৎ গতকালের বদলা নিচ্ছে।

সহাস্যে বলি, "আমরা কেন সাইকেল নিই নি জানিস?"

"কেন?"

"আমরা ঐ সাহেব অথবা তোর মতো ভাল সাইক্লিস্ট্ নয় বলে।"

পথটা ডাইনে বাঁক নিয়ে আবার উৎরাই হয়েছে। ঝড়ের বেগে টাঙ্গা নেমে এসে একফালি সমতলে পৌঁছল। ডানদিকে ছোট একটি জলাশয়, আর বাঁদিকে বড় বড় গাছ।

সমতলের শেষে আবার চড়াই পথ। চড়াইয়ের শেষে চতুর্ভুজ মন্দির—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনও মন্দির সংস্কার শেষ হয় নি। শালবল্লী বাঁধা রয়েছে। গতবারও যে দেখে গিয়েছি!

মন্দিরের চারিদিকে তারকাঁটার বেড়া। লোহার গেট ঠেলে ভেতরে আসি। একফালি উঠান পেরিয়ে সিঁড়ি। দশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরচত্বরে উঠে এলাম।

পশ্চিম-মুখী মন্দির। এটি খাজুরাহের দুটি পশ্চিম-মুখী মন্দিরের একটি। খাজুরাহের অন্যান্য মন্দির সবই পূর্বমুখী।

চত্বর থেকে আরও আট ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে অর্ধমণ্ডপে পৌঁছই। তারপরে অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ ছাড়িয়ে গর্ভমন্দিরের সামনে আসি। গর্ভগৃহের দ্বারে

দু-পাশে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি আর মাঝখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং নবগ্রহ। আমরা প্রণাম করি।

ছোট মন্দির, কিন্তু ছোট নয় মন্দিরের বিগ্রহ। সুবিশাল মূর্তি। সোয়া দশ ফুট দীর্ঘ দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ বিগ্রহ। কেবল দণ্ডায়মান নয়, চলমানও বটে—একখানি পা আগে আরেকটি পেছনে। পেছনের পায়ের শুধু সামনের অংশটি মাটিতে ঠেকানো। তার মানে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন।

চতুর্ভুজ মূর্তি, কিন্তু চারখানি হাতের একখানিও অক্ষত নেই। একটি হাত সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে, একটি হাতের চেটো পর্যন্ত রয়েছে। একখানির একটি আঙুলেরও মাথা নেই, আরেকখানির কেবল তিনটি আঙুল অক্ষত।

তাহলেও ভারী সুন্দর বিগ্রহ। মুখখানি যেমন নিখুঁত, তেমনি পরম প্রশান্ত। বিগ্রহের মুকুটে জটাধারী শিবের ছোটমূর্তি—তাঁর মাথায় গঙ্গার ধারা, কান গলা কোমর ও হাত-পায়ে পাথর খোদাই করে নানা রকমের অলঙ্কার। মূর্তির পা থেকে কোমর পর্যন্ত কৃষ্ণের তনু, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত চতুর্ভুজ নারায়ণের শরীর, আর মুকুটে শিবের প্রতীক। আমরা কৃষ্ণ-নারায়ণকে প্রণতি জানাই, হরিহরকে প্রণাম করি।

কানিংহ্যাম এই বিগ্রহকে চতুর্ভুজ নারায়ণ বলে সনাক্ত করায় এই মন্দির চতুর্ভুজ মন্দির নামে পরিচিত। কিন্তু কিছুদিন আগে প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী আর. সেনগুপ্ত প্রমাণ করেছেন, এটি নারায়ণের বিগ্রহ নয়, দক্ষিণামূর্তি শিব। শুধু তাই নয়, কানিংহ্যাম বলেছিলেন—এই মন্দিরের নির্মাণকাল ১১৮০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ কিন্তু শ্রীসেনগুপ্ত বলছেন—মন্দিরটি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

দর্শন শেষে নেমে আসি মন্দির থেকে। আর তখুনি দেখা হয় ওদের সঙ্গে, সেই সাইক্লিস্ট্ দম্পতির সঙ্গে। তারা এইমাত্র এসে পৌছল। গেটের সামনে সাইকেল রেখে উঠে এসেছে মন্দিরচত্বরে।

চোখাচোখি হতেই ওরা দু'জন হেসে দেয়। কোন দেশের মানুষ বুঝতে পারছি না। তবু জিজ্ঞেস করি, "Can you follow English?"

"Yes." ছেলেটি উত্তর দেয়। মেয়েটি মৃদু হাসে।

"You are from?"

"Israel···Jew."

খুশি হই, ওরা আমাদের শত্রু না হলেও ঠিক বন্ধু নয়। তবু ওরা আমাদের দেশ দেখতে এসেছে। কিন্তু আমি সেকথা বলতে পারার আগেই

ছেলেটি ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের বুকে টোকা মেরে বলে, "Me ...Oded...Oded Gal."

একই ভঙ্গীতে নিজেকে দেখিয়ে মেয়েটি জানায়, "Oshrat...Mrs. Oshrat Gal."

একে একে আমাদের পরিচয় দিই।

আমরা কলকাতার লোক শুনে খুশি হয় ওরা। পুলকিত কণ্ঠে ওশরাত বলে, "তোমাদের কলকাতা দেখেছি। আমরা ব্যাংকক থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। সেখান থেকে পুরী গিয়েছি। তারপরে দার্জিলিং কাঠমাণ্ডু পাটনা ও বারাণসী হয়ে এসেছি এখানে। কলকাতা যেমন বড়, তেমনি বৈচিত্র্যময়—ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর। আমাদের খুব ভাল লেগেছে।"

কথাটা আমাদেরও ভাল লাগে। শুনেছি ভালো লাগে না বলে বিদেশী পর্যটকদের কলকাতা দেখার উৎসাহ দেওয়া হয় না। ফলে অধিকাংশ বিদেশী পর্যটক কলকাতায় যান না।

সেই কথাটাই বলি ওদের। ওরা প্রতিবাদ করে বলে, "যে জন্য কলকাতার দুর্নাম, তা তো দেখছি তোমাদের সব শহরের পক্ষেই সমান সত্য। ভারতের সব শহরেই পথে মানুষ বাস করে, পথে মানুষ জন্মায়—পথেই মারা যায়।"

ওশরাত থামলে ওডেড তার মনের কথা বলতে শুরু করে, "ভারত মহান দেশ, আমাদের খুবই ভাল লেগেছে ও লাগছে। ইহুদীদের মতো হিন্দুরাও পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিসমূহের অন্যতম। তোমাদের ধর্ম সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার সামগ্রী। তোমাদের দেশ দেখে, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা সত্যই অভিভূত। কিন্তু..."

হঠাৎ থেমে যায় ওডেড। আমরা ওর মুখের দিকে তাকাই। সে চুপ করে আছে। আমি বলি, "থামলে কেন? বল না কি বলছিলে?"

"কিছু মনে করবে না তো?"

"না, না। মনে করব কেন? বল না, কি বলছিলে?"

"তোমাদের দেশে একটা জিনিস আমাদের ভাল লাগছে না।"

"কি?"

"তোমাদের গণতন্ত্রী দেশ। তবু এখানে দেখছি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী আছেন, তেমনি রয়েছেন দরিদ্রতম মানুষ। ভারতে এসে এত ভিক্ষুক দেখতে হবে, এটা আগে ভাবতে পারি নি।"

হয়তো কোন বিদেশী পর্যটকই পারেন না। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর নয়। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "আমরা দর্শন করে এসেছি, তোমরা যাও, ভেতরটা দেখে এসো!"

"না।" ওভেড বলে, "আমরা ভেতরে যাবো না। চলো, বাইরেটাই দেখা যাক্।"

"কিন্তু, মন্দিরের বিগ্রহটি দেখবার মতো।"

"তা হোক্ গে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আমাদের ঢুকতে দেয় নি। তারপর থেকে আমরা আর কোন মন্দিরের ভেতরে যাই না।"

লজ্জা পাই। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম দেবালয়েরদ্বার আজও সবার জন্য উন্মুক্ত হল না, এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে?

তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করি। একটি শিখরযুক্ত মাঝারি মন্দির, উঁচু ভিতের ওপরে অবস্থিত। ভিতের গায়ে কোন কারুকার্য নেই। তবে বাইরের দিকে সারা মন্দিরগাত্রে তিনসারি মূর্তিমালা রয়েছে। এটাই খাজুরাহো মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ-মন্দিরের অধিকাংশ মূর্তি সাধারণ মানের। সামান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি রয়েছে। আমরা সেগুলি দেখি এবং ইজরাইলের বন্ধুদের দেখাই। প্রথমেই উত্তরদিকের দেওয়ালের কাছে আসি। এই দেওয়ালে মাঝখানের সারিতে রয়েছে—সিংহমুখী এক অপরূপা নারীমূর্তি। পণ্ডিতরা বলেন—ইনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের শক্তি।

নারসিংহী ছাড়াও এ দেওয়ালে আছে—লক্ষ্মী বিষ্ণু ও নরসিংহ মূর্তি। আছে কয়েকটি ভারী সুন্দর উড়ন্ত বিদ্যাধর ও নৃত্যরতা নারীমূর্তি। খাজুরাহে এইসব নারীমূর্তিকে বলা হয় সুরসুন্দরী।

দেখতে দেখতে আমরা পুবদিকে আসি। এদিকে একটি চমৎকার সূর্যমূর্তি ছিল। কিন্তু এখন তাঁর মাথাটি নেই। শিব ও নন্দীর মূর্তিদুটিও মন্দ নয়। আর ওপরের সারিতে কয়েকজন সুরসুন্দরী সত্যি দেখার মতো।

এবারে দক্ষিণদিকে আসি। আর এসেই ওশরাতের নজর পড়ে মূর্তিটির দিকে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, "এটা কেমন মূর্তি?"

একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার পক্ষে অবাক হবার কথাই বটে। একই দেহে হর-পার্বতী, দেব-দেবী, নারী-পুরুষ।

ওশরাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। অতএব শুরু করতে হয়,…"striking form…which attempted to abolish sex

distinction among the divinities. Here was sculptured an image half-male and half-female which could be worshipped both by Saktas and Saivas. The Pauranic myth, that God Siva took such a form to satisfy his extreme desire for his consort Sati, lent weight to this concept. Now Ardha-narisvara has become the God of marriage worshipped by the newly weds who seek to attain true marital bliss through cordial relations between the couple." *

## ॥ সাত ॥

চতুর্ভুজ মন্দির থেকে নেমে আসি। আমরা টাঙ্গায় উঠি, ওরা সাইকেলে।

চড়াই-উৎরাই মাটির পথ। পথের বুকে ঘাস আর কাঁটাগাছ। দু'জনকে বইতে ওডেভের বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবু প্রস্তাবটা করা উচিত হবে কি? ওশরাত যুবতী।

সৌরীনবাবু বলেন, "আমি বৃদ্ধ, আপনি প্রৌঢ়। একবার বলে দেখতে পারেন।"

অতএব বলি, "তোমরা একজন আমাদের টাঙ্গায় উঠে আসতে পারো।"

"তোমাদের কষ্ট হবে না তো?" ওডেভ জিজ্ঞেস করে।

"না, না, কষ্ট হবে কেন?" সৌরীনবাবু বলেন, "এই তো জায়গা রয়েছে।"

ওশরাত সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। টাঙ্গাওলাকে থামতে বলি। ওশরাত উঠে আসে। টাঙ্গা এগিয়ে চলে। সৌরীনবাবু ও রণজিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে ওডেভ টাঙ্গার পেছনে সাইকেলে আসছে।

ওশরাতও কিন্তু চুপ করে নেই। সে আমার ও গৌতমের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বলছে, "ওডেভ একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। তেলআবিব থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি।"

* 'Khajuraho Sculptures And Their Significance' by Dr. Urmila Agarwal.

"তুমি কোন কাজ কর কি ?" প্রশ্ন করি।

সে উত্তর দেয়, "আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু করতেই হয়। গত যুদ্ধ থেকে ফিরে কয়েক মাস হাসপাতালে নার্সের কাজ করতে হয়েছে। এখন একটি নার্সারী স্কুলে শিক্ষকতা করছি।"

"তুমিও যুদ্ধে গিয়েছিলে !"

ওশরাত একটু হাসে। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে, ভারী সুন্দর দেখায়। সে উত্তর দেয়, "যুদ্ধে না গেলে চলবে কেমন করে ? আমাদের একদিকে সমুদ্র তিনদিকে শত্রু। তারা আমার দেশকে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। ছোট আমাদের দেশ, সংখ্যায় আমরা মাত্র তিরিশ লক্ষ। তাই ছাত্রজীবনে আমাদের দেশে প্রত্যেক ছেলেকে তিন বছর ও প্রত্যেক মেয়েকে দু বছর মিলিটারী ট্রেনিং নিতেই হয়। যুদ্ধ করেই তো আমাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে, হয়তো বা চিরকাল এইভাবেই বেঁচে থাকতে হবে।"

চুপ করে ওশরাত। শেষদিকে ওর কণ্ঠস্বরটা একটু ভারী হয়ে উঠেছিল।

আমিও চুপ করে থাকি। টাঙ্গা ছুটে চলেছে খাজুরাহের পথে। আমরা চতুর্ভুজ থেকে দুলাদেও মন্দিরে চলেছি। এই দু'টি মন্দির নিয়েই খাজুরাহের 'সাদার্ন গ্রুপ অব্ টেম্পলস' বা দক্ষিণ-মন্দিরগোষ্ঠী।

কিন্তু না, মন্দিরের কথা নয়। আমি ভাবছি ওশরাতের কথা। বত্রিশ বছর আগে পড়া শ্রদ্ধেয় যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' বইখানির কয়েকটি অনুচ্ছেদ মনে পড়ছে আমার। যাযাবর লিখেছেন—

'১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যখন সঙ্কটজনক কাল, ইংলণ্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক ( ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাইম ভাইজমান )। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন তথাস্তু।

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ? অর্থ?

—কিছু নয়। একটি মাত্র যাঞ্চা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইহুদীর ন্যাশন্যাল হোম।

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান। অবশ্য কাগজে-পত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইহুদীদের।......'

দৃষ্টিপাত প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ সালে আর এখন বালফোর ঘোষণার পরে ষাট বছর অতিবাহিত, আজও ইহুদীদের সেই ন্যাশন্যাল হোমের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।...

"আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিসমূহের অন্যতম, বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের অবদান কারও চেয়ে কম নয়।..."

আমার ভাবনা থেমে যায়। ওশরাত নীরবতা ভঙ্গ করেছে। সে বলে চলেছে, "অথচ দু-হাজার বছর ধরে আমরা কেবল মার খেয়ে আসছিলাম। ফলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম জাতি হয়েও আজ আমাদের সংখ্যা মাত্র তিরিশ লক্ষ। বাধ্য হয়ে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ আমরা চাই নি, আজও চাই না। আমরা শান্তি চাই। সবার সঙ্গে মিলে-মিশে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চাই।"

"কিন্তু তোমরা অধিকৃত ভূখণ্ড না ছাড়লে ওঁরা তোমাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে কি ভাবে?"

আমার প্রশ্ন শুনে ওশরাত একটু গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর স্বরেই বলে, "এ প্রশ্ন করার আগে তোমাদের মনে করতে হবে কেন এই যুদ্ধ এবং কি অবস্থায় আমরা ওদের ভূখণ্ড অধিকার করেছি? তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বালফোর ঘোষণায় প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইহুদিদের জন্য জাতীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট হলেও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইজরাইলের স্বষ্টি তোমাদের স্বাধীনতার কয়েক মাস পরে। তার আগে আমরাও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

আমি মাথা নাড়ি। ওশরাত বলতে থাকে, "১৯৪৮ সালের ১৬ই মে বৃটিশদের কাছ থেকে আমাদের বাসভূমির শাসনভার আমরা নিজেদের হাতে নিই.এবং ক্ষুদ্র দেশটির নাম রাখি ইজরাইল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা

তোমাদের জানিয়ে রাখা দরকার, ইজরাইল কিন্তু শুধু ইহুদিদের দেশ নয়, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আদমসুমারির সময়েও ইজরাইলে ১,৭০,৮৩০ জন মুসলমান, ৫০,৫৪৩ জন খ্রীষ্টান এবং ২৪,২৮২ জন অন্যান্য ধর্মের মানুষ শান্তিতে বাস করতেন। এবং এখনও ইজরাইলে প্রায় এক লক্ষ অন্য ধর্মাবলম্বী লোক বাস করছেন আর তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও আছেন।”

একবার থামে ওশরাত। তারপরে আবার শুরু করে, “১৯৪৮ সালের ১৬ই মে শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়েই আমরা সরকার গঠন করি এবং পরদিনই আমেরিকা ও রাশিয়া সে সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন। কিন্তু প্রতিবেশী মিশর, ট্রান্সজর্ডন, ইরাক এবং সিরিয়া হুমকি দেয় যে তাঁরা আমাদের দেশ আক্রমণ করবে। ইউ. এন. ও. একজন মধ্যস্থ নির্বাচিত করেন। কিন্তু সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে ২০শে মে আরব-দেশগুলো তিনদিক থেকে ইজরাইল আক্রমণ করে। তারা আমাদের দক্ষিণ ও পুবের কিছু অংশ অধিকার করে নেয়। শুধু তাই নয়, তারা জেরুজালেমে আমাদের পবিত্র অংশটি পর্যন্ত অবরোধ করে।

“সেই থেকেই বিবাদের সূত্রপাত এবং তা আজও চলছে। চলেছে কারণ বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা তাদের হামলা বরদাস্ত করতে পারি নি। আমরা আমাদের জমি উদ্ধার করে নিয়েছি।

“তারা থামে নি। প্রায় উনিশ বছর ধরে ওরা ক্রমাগত আমাদের সব সীমান্তে হানাদার পাঠিয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য সুবিধা করতে পারে নি। তারপরে ওরা বুঝেছে হানাদার পাঠিয়ে কিছু হবে না। এবং ওদের ধারণা হয়েছে, আরবদের সম্মিলিত শক্তির কাছে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

“তাই প্রেসিডেন্ট নাসের সিরিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করলেন। ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে সহসা সিরিয়া আমাদের সীমান্তে বোমা ও গোলাবর্ষণ শুরু করল। আমরা গুলি করে তাদের ছ'খানি মিগ বিমান মাটিতে ফেলে দিলাম। ১৬ই মে প্রেসিডেন্ট নাসের সিনাই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন বক্তৃতা দিতে থাকলেন —আমি ইজরাইলকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে মিশিয়ে দেব।…ইহুদীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করব ইত্যাদি। তিনি মিশর-ইজরাইল সীমান্ত থেকে নিরাপত্তা পরিষদের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে বললেন। ১৯৫৬ সাল থেকে তাঁরা সেখানে অবস্থান করছিলেন।

"তারপরেই নাসের আকাবা উপসাগর দিয়ে আমাদের জলপথ অবরোধ করলেন। আমরা নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করলাম—এই অবরোধ করে মিশর অন্তর্জাতিক আইন অমান্য করেছে এবং এটি আমাদের দেশ আক্রমণের সামিল। ব্রিটেন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থন করলেন কিন্তু রাশিয়া বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। নাসের বললেন—যারা ইজরাইলকে সমর্থন করবে, সুয়েজখাল দিয়ে আমি তাদের জাহাজ যেতে দেব না। তিনি আমাদের সীমান্তে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করলেন। জর্ডন, সৌদি আরব, ইরাক ও আলজিরিয়া তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

"আমরা বুঝতে পারলাম যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং আমরা যখন একা, তখন আমাদেরই প্রথম আঘাত হেনে ওদের দুর্বল করে দিতে হবে।

"তাই করলাম আমরা। ৫ই জুন সকালে ওরা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই আমাদের বিমানবাহিনী একসঙ্গে মিশরের ষোলটি বিমানবন্দর, সিরিয়া ও জর্ডনের সব কয়টি এবং ইরাকের একটি বিমানবন্দরের ওপর আক্রমণ চালালো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আরব বিমানবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম। তারপরে বিমানবাহিনীর ছত্রছায়ায় আমাদের স্থলবাহিনী মিশর জর্ডন ও আরব জেরুজালেম আক্রমণ করল। বিমানশক্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ওদের তখন পেছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ফলে পরদিনই আমরা সিনাই উপদ্বীপের বিরাট অংশসহ গাজা স্ট্রিপ দখল করে নিলাম এবং প্রাচীন জেরুজালেম নগরী অবরোধ করলাম।

"নাসের সুয়েজখাল বন্ধ করে দিলেন। আরবরা ব্রিটেন, আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীতে তেল রপ্তানী বন্ধ করল। কারণ তাদের ধারণা ঐ তিনটি দেশের মদতেই আমরা অমন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। একবারও ভেবে দেখে নি যে তারাও রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান পেয়েছিল। আমাদের সাফল্যের মূলে সমরবিশারদদের বুদ্ধি এবং বৈমানিকদের দুঃসাহস, সর্বোপরি আমাদের দেশপ্রেম। যাই হোক, সেদিনই নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু ওরা তখনও যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখছে, সুতরাং আমাদেরও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

"পরদিন ৭ই জুন আমাদের সেনাবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে সিনাইতে মিশরীয় অবরোধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। আমরা কয়েকটি শহর দখল করে নিলাম। প্রচুর সাজ-সরঞ্জামসহ বেশ কিছু মিশরীয় সৈন্য আমাদের হাতে

বন্দী হল। জর্ডন সীমান্তেও আমরা জর্ডন নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হলাম। ভয় পেয়ে সন্ধ্যা আটটার সময় জর্ডন যুদ্ধবিরতি মেনে নিল।

"৮ই জুন মিশরীয় বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে সিনাই সীমান্তে আরেকবার অবরোধ গড়ে তুলতে চাইল, পারল না। আমরা সুয়েজখালের সমগ্র পূর্ব তীর দখল করে নিলাম খালের ওপরে আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হল।

"প্রেসিডেন্ট নাসের বুঝতে পারলেন, ইজরাইলকে ধ্বংস করা সম্ভব নয় এবং তখনও যুদ্ধ না থামালে মিশরই ধ্বংস হয়ে যাবে। নিরুপায় নাসের সেদিন বিকেলেই যুদ্ধবিরতি মেনে নিলেন।

"এই চারদিন আমাদের মিশর ও জর্ডন সীমান্তেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আর তারই সুযোগ নিয়ে সীমান্তের উচ্চভূমি থেকে সিরিয়া আমাদের গ্রামগুলোর ওপরে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। তারা নির্বিচারে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করছিল। অতএব ৯ই জুন আমরা সিরিয়ার দিকে মনযোগী হলাম। আকাশ ও মাটিতে একসঙ্গে অভিযান চালিয়ে দু-দিনের মধ্যে সীমান্তের সমস্ত উচ্চভূমি অধিকার করে সিরিয়ার ১২ মাইল ভেতরে ঢুকে গেলাম। ওদের একটি প্রধান শহর দখল করে নিলাম। বাধ্য হয়ে ১০ই জুন বিকেল সাড়ে চারটায় সিরিয়া যুদ্ধবিরতি মেনে নিল।" থামল ওশরাত।

টাঙ্গা ছুটে চলেছে খাজুরাহের পথ দিয়ে। আমরা চতুর্ভুজ দেখে দুলাদেও মন্দিরে চলেছি। আমার পাশে ওশরাত, ইজরাইলের মেয়ে ওশরাত। সে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে তার দেশের কথা বলছে।

ওশরাত আবার বলতে শুরু করেছে, "ওরা জোট বেঁধে আমাদের পিষে মারতে চেয়েছিল, আমরা পাল্টা আঘাত হেনে রক্তের বিনিময়ে ওদের কিছু বসতিহীন বন্ধ্যা জমি দখল করেছি। আমাদের নিরাপত্তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই নিয়েছি—তার বেশি নয়। আমরা চাই, হানাদারদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে এবং আবার ওরা আক্রমণ করলে যুদ্ধটা যাতে ওদের জমিতে হয়। আমাদের দেশটুকু যে বড়ই ছোট।"

"তাহলে কি তোমরা অধিকৃত ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেবে না?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়ই দেব।" ওশরাত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "তার আগে আমরা প্রতিশ্রুতি পেতে চাই—ওরা আমাদের শান্তিতে বেঁচে থাকতে দেবে।

ওরা আমাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেই সিনাই সহ সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল আমরা ওদের ফিরিয়ে দেব।"

"কিন্তু সিনাইতে তোমরা তেল আবিষ্কার করেছো। সিনাই ফিরিয়ে দিলে যে তোমাদের সমূহ লোকসান?"

"হ্যাঁ। সিনাই এখন আর মরুভূমি নয়। আমরা সেখানে তেল খুঁজে বের করেছি, রাস্তা-ঘাট ও জনপদ তৈরি করেছি। শুধু সিনাই নয়, অধিকৃত সমস্ত জায়গাই আমরা সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ করে তুলেছি। তবু আমরা শান্তির জন্য সব ফিরিয়ে দিতে রাজী আছি কিন্তু তার আগে নিশ্চিন্ত হতে চাই—ওরা হামলাবাজি বন্ধ করবে, আমাদের শান্তিতে বেঁচে থাকতে দেবে।"

টাঙ্গা বামিঠা-রাজনগর রোডে অর্থাৎ বাসপথে ফিরে এসেছে। আবার বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলেছে। তবে আমরা বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগুবো না, তার আগেই খাজুরাহো গ্রামের পথ ধরব, দুলাদেও মন্দিরে যাবো।

ওডেড এবং ওশরাত আমাদের সঙ্গে দুলাদেও পর্যন্তই থাকছে। তারপরে ফিরে যাবে রাহিল জনতা হোটেলে। ওরা গতকাল জৈন মন্দির এবং 'ওয়েস্টার্ন গ্রুপ' দেখেছে। আজই বিকেলের বাস ধরে সাতনা চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে রওনা হবে দক্ষিণ-ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তারপরে আবার ফিরে আসবে ভারতে—কেরালা-গোয়া বম্বে অজন্তা-ইলোরা ও আগ্রা দেখে দিল্লী যাবে। দিল্লী থেকে বিমানে দেশে ফিরবে।

টাঙ্গা ডাইনে বাঁক নিল। বড় রাস্তা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথ ধরে খাজুরাহো গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

আবার ওশরাত নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, "তোমাদের দেশে এসে আমাদের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।"

"কি বল তো?"

"তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের 'ডিপ্লোমেটিক রিলেশন' প্রায় না থাকার মতো। আমরা থাইল্যাণ্ড থেকে ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছি। এসেছি কারণ এই বিচিত্র বিশাল সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ দেখার লোভ সামলাতে পারি নি। কিন্তু সত্যি বলতে কি খুবই ভয়ে ভয়ে এসেছি।"

"কেন?" সহাস্যে প্রশ্ন করি।

মুচকি হেসে উত্তর দেয় ওশরাত, "কি জানি, তোমরা আমাদের কি চোখে দেখবে, কেমন ব্যবহার আমরা পাবো তোমাদের কাছ থেকে?"

"তা এখন কি দেখলে ?"

"দেখলাম, আমাদের ভয় একেবারে অমূলক। ডিপ্লোমেটিক রিলেশন যাই হোক না কেন, তোমরা আমাদের খুবই ভালবাসো। সত্যি বলতে কি অন্যান্য বিদেশী ট্যুরিস্টদের চেয়ে সর্বত্র আমরা যেন বেশি সহযোগিতা পাচ্ছি।"

"আমি তো আগেই বলেছি, তোমাদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি।"

"তাহলে কেন তোমরা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছ না ? কেন আমাদের ব্যাঙ্কক থেকে ভিসা নিয়ে কলকাতায় আসতে হয় ? আমরা তো কখনও তোমাদের সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করি নি। বরং যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু তোমরা সে হাত ফিরিয়ে দিয়েছো। অলিম্পিক নগরে আমাদের অ্যাথ্‌লীটদের বর্বরের মতো হত্যা করার প্রতিবাদে অলিম্পিক বন্ধ হয় নি, বরং সেই ছুতোয় এশিয়ান গেমস্‌-এ আমাদের ছেলে-মেয়েদের যোগ দিতে দেওয়া হল না। আমাদের বিমান হাইজ্যাক্‌ করতে পারবে কিন্তু আমরা সেই বিমানের যাত্রীদের উদ্ধার করে আনতে পারব না ! আমরা তোমাদের কাছে ন্যায়বিচার চাই। আর…"

সহসা থেমে যায় ওশরাত। দুঃখে ও অভিমানে তার কণ্ঠ বোধ হয় রুদ্ধ হয়ে এসেছে, চোখদুটিও অশ্রুসজল। সে চোখ মোছে। তারপরে কোনমতে আবার বলে, "আমরা তোমাদের সঙ্গে তো কখনো কোন খারাপ ব্যবহার করি নি, তাহলে তোমরা কেন আমাদের প্রতি এমন বিরূপ হয়ে রয়েছো ?'

সে সজলচোখে আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি ওর প্রশ্নের কি উত্তর দেব ?

"উৎরাইয়ে সাব !"

টাঙ্গাওয়ালা রক্ষা করে আমাকে। আমরা পৌঁছে গিয়েছি। ডানদিকে খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে দুলাদেও মন্দির। মেঠোপথে টাঙ্গা যাবে না, এখানেই নামতে হবে আমাদের। আর তাই ওশরাতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি টাঙ্গা থেকে। একা একা এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। আমার বাঁয়ে অর্থাৎ পুবে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে জৈন মন্দির। পেছনে অর্থাৎ উত্তরে প্রায় আধকিলোমিটার দূরে খাজুরাহো গ্রাম। সেখানেও

কয়েকটি মন্দির আছে। কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটেই এসব মন্দির দেখব। তাই গৌতম টাঙ্গা ভাড়া মেটাচ্ছে। সবার সঙ্গে ওশরাতও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। আর আমি এই সুযোগে এগিয়ে এসেছি দুলাদেও মন্দিরের দ্বারে।

মন্দিরের চারিদিকে তেমনি তারকাটার বেড়া। গেট পেরিয়ে ভেতরে আসি। সামনে এককালি উঠান। গেটের বাঁদিকে একটি গোড়াবাঁধানো বড় গাছ। উঠানের একাংশ ছায়াশীতল।

উঠান পেরিয়ে সিঁড়ি। এগারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরচত্বরে উঠে আসি। চতুর্ভুজ মন্দির কিংবা বিমানবন্দর ঠিক দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে যে খুড়ার নালা পেরিয়ে আমরা চতুর্ভুজে গিয়েছি, সেটি এখানেও রয়েছে। বলতে গেলে তারই তীরে দুলাদেও মন্দির। সেকালে এই নালাটি নিশ্চয়ই প্রশস্ত স্রোতস্বিনী ছিল।

অনেকে এ মন্দিরকে 'কুন্ওয়ার' ( Kunvar) অর্থাৎ কুমার মন্দির বলেন। কারণ জনৈক চান্দেলা রাজকুমার এটি নির্মাণ করেছেন। তাহলেও বলব দুলাদেও মন্দির নামেই এটি অধিক পরিচিত। স্থানীয় ভাষায় দুলাদেও বললে বোঝায় চরিত্রবতী নববধূ বা সতী-কনে। গতবছর এখানে এসে এই মন্দির নির্মাণের কিংবদন্তীটি শুনেছি।

কথিত আছে—জনৈক চান্দেলা যুবরাজ ভালোবেসে এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরে তিনি একদিন নববধূকে নিজের ঘোড়ায় সামনে বসিয়ে বেড়াতে বের হন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে হাজির হলেন এখানে। একে দিগন্ত-প্রসারী উন্মুক্ত প্রান্তর, তার ওপর লজ্জাবতী দুলাদেও তাঁর স্পর্শ বাঁচিয়ে জড়সড় হয়ে সামনে বসে আছে। যুবরাজ ভাবলেন, জোরে ঘোড়া ছোটালে যেমন অশ্বারোহণের আনন্দ পাওয়া যাবে, তেমনি ভয় পেয়ে তাঁর লজ্জাবতী বধূ তাঁকে জড়িয়ে ধরবেন।

নববধূকে কিছু না বলেই তিনি ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন। তেজী ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফ দিল। অপ্রস্তুত নববধূ টাল সামলাতে পারলেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, পারলেন না।

নববধূ ছিটকে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। যুবরাজ তাঁর অচেতন দেহটি কোলে করে নিয়ে গেলেন রাজবাড়িতে। রাজবৈদ্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন না। স্বামীর কোলে

মাথা রেখে নববধূ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভাল করে ফোটার আগেই ফুলটি পড়ল ঝরে।

আর যুবরাজ? নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। সকলের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি দিন-রাত বসে থাকতেন এখানে। নীরবে অশ্রুপাত করতেন আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে তাঁর প্রিয়তমাকে কাছে ডাকতেন। বলতেন—হে অভিমানিনি, একবার……আরেকটিবার তুমি আমার কাছে এসো।…

অবশেষে এক নির্জন চাঁদনী রাতে তুলাদেও সত্যই যুবরাজের কাছে এলেন। স্নিগ্ধস্বরে বললেন—তুমি এমন করলে যে আমি বড় কষ্ট পাই। আমি এখন স্বর্গের দেবী হলেও তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি। আমি নয়, যখন সময় হবে, তখন তুমিই যাবে আমার কাছে। আবার মিলন হবে আমাদের।

—কিন্তু ততদিন আমি একা একা থাকব কেমন করে? যুবরাজ জিজ্ঞেস করেন।

নববধূ উত্তর দেন—ততদিন কেবল অশ্রুপাত করে আমার আত্মাকে কষ্ট না দিয়ে, তুমি আমার জন্য এখানে একটি মন্দির তৈরি করো। দেবী হয়ে আমি সেই মন্দিরে চিরস্থায়ী হব। সেই সঙ্গে আমার অতৃপ্ত যৌবনও তৃপ্ত হবে।

এই সেই মন্দির। সেই শাশ্বত প্রেমের ঐতিহাসিক নিদর্শন, রূপতীর্থ-খাজুরাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—তুলাদেও মন্দির।

ওরা আসে, উঠে আসে মন্দির-চত্বরে। আমার ভাবনা শেষ হয়। শুরু হয় মন্দির দর্শন।

কিন্তু কিছু দেখে উঠতে পারার আগেই হাত-ইসারা করে ওশরাত বলে ওঠে, "ওখানে কি একটা মন্দির ছিল নাকি?"

একটু আগে চৌকিদার এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি তাকে দূরের ঐ ভগ্নস্তূপটার কথা জিজ্ঞেস করি। সে উত্তর দেয়, "ওটা আগে নীলকণ্ঠ মন্দির ছিল।" কথাটা বুঝিয়ে দিই ওদের। সেই সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটাও বলতে হয়।

চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়েই মন্দির পরিক্রমা শুরু করি। পূর্বমুখী মন্দির। ছোট মন্দির। মাত্র ৬৯ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ও ৪০ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া। তাহলেও খাজুরাহের অন্যান্য ছোট মন্দিরের মতো এটিও চার ভাগে বিভক্ত—মূল শিখরের চারিদিকে তিনসারি ছোট ছোট শিখর। গঠনশৈলী অনেকটা

দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরের মতো হলেও অলঙ্করণে খাজুরাহের নিজস্ব শিল্পসম্পদে সম্পদশালী।

বিরহের স্মৃতিসৌধ হয়েও এটি শিব মন্দির। বসালা (Vasala) নামে জনৈক শিল্পী বিরহী যুবরাজের জন্য এই অনিন্দ্যসুন্দর শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। পণ্ডিতদের মতে এটি ১১০০ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত। এটি খাজুরাহের সব চেয়ে নূতন মন্দির। অর্থাৎ সেই গৌরবময় যুগের শেষ নিদর্শন।

বাইরের দিক দেখতে দেখতে আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছি। মন্দিরগাত্রে তিনসারি মূর্তিমালা। যেমন স্থাপত্য, তেমনি ভাস্কর্য। বিশেষ করে ভাস্কর্যশিল্প অতিশয় উচ্চমানের। কানিংহাম বলেছেন—এটি খাজুরাহের সুন্দরতম মন্দিরগুলির অন্যতম।

আগেই বলেছি বাইরের দিকে মন্দিরগাত্রে তিনসারি মূর্তিমালা। এই পুবদিকের দেওয়ালে প্রথম নজর পড়ল ওপরের সারিতে—একটি মেয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

এদিকে আরেকটি মূর্তিও ভাল লাগে—মানভঞ্জন। না, শ্রীমতীর নয়, শ্রীমানের। শ্রীমানের মান হয়েছে, শ্রীমতী তার পায়ের কাছে বসে মান ভাঙাবার চেষ্টা করছে। মূর্তিটা ওদের দেখাতেই ওডেড বলে ওঠে, "Most unusual. It should have been the opposite."

আমরা ওর কথা শুনে হেসে দিই। ওশরাত একবার সেই মূর্তি আরেকবার তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। মনে হচ্ছে ওডেডের মন্তব্যে তার কোন আপত্তি নেই। থাকবে কেমন করে? 'দেহি পদপল্লবমুদারম' কথাটি কেবল পদ্মাবতী-চরণ-চারণ কবি-হৃদয়ের বারতা নয়, সারা বিশ্বের মর্মবাণী।

এদিকের দেওয়ালে কয়েকটি উড়ন্ত বিদ্যাধর ও নৃত্যরতা সুরসুন্দরীর উল্লেখযোগ্য মূর্তি রয়েছে। আর রয়েছে কিছু বিচিত্র মিথুনমূর্তি।

মিথুনমূর্তি রয়েছে মন্দিরের চারিদিকেই। তবে তাদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। দেব-দেবী ও সুরসুন্দরীদের অসংখ্য মূর্তি রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু অপরূপ মূর্তি। বহু ভাল ভাল মূর্তি অবশ্য ভেঙে গিয়েছে। কিছু মহাকাল বিনষ্ট করেছে আর কিছু ধর্মান্ধ আক্রমণকারী। কিন্তু তাদের কথা থাক। তাদের কথা উঠলে ওশরাত আবার আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে।

চত্বর থেকে ছয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরতোরণে। এবারেও ওডেভ মন্দিরে ঢুকতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু বুঝিয়ে-সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ভেতরে আনতে পেরেছি। তোরণদ্বারে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি দুটি ভাল লাগে। তাঁরা ফুলের ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভেতরের 'সিলিং' এবং দেওয়াল অপরূপ কারুকার্য এবং বহু বিচিত্র-সুন্দর মূর্তি সমন্বিত।

মণ্ডপটি ছয়-কোণা, বেশ বড়। অষ্টবসু ও যমরাজের মূর্তিও ভাল লাগে আমাদের। ভাল লাগে একটি নারীমূর্তি। সে দু-হাতে দুটি ধুনুচি নিয়ে আরতি করছে। আর ভাল লাগে গর্ভগৃহের দ্বারে ঢোলকের মূর্তিটি। ওডেভ বলে ওঠে, 'The Drummer'.

ওশরাত মাথা নাড়ে।

গর্ভগৃহের দ্বারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি। আমরা প্রণাম করে ভেতরে তাকাই, দর্শন করি দুলাদেও শিবের লিঙ্গমূর্তি। চারকোণা বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। বেশ বড মূর্তি—গায়ে খাঁচ-খাঁচ কাটা।

গৌতম বলে, "প্রায় ন'শ বছরের পুরনো অথচ দেখুন কি রকম চকচকে রয়েছে!"

"মৃদু হেসে চৌকিদার বলে, "এটি আদি-বিগ্রহ নয়। যে কোন কারণেই হোক, এ মন্দির বহুকাল বিগ্রহশূন্য পড়ে ছিল। কয়েক বছর আগে ছতরপুর মহারাজার দেওয়ান শুকদেব বিহারী মিশ্র এই লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

নবপ্রতিষ্ঠিত হলেও বিগ্রহ বিগ্রহই, সে জগৎসংহর্তা মহাদেবের মূর্ত প্রতীক। অতএব সশ্রদ্ধ অন্তরে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে প্রণাম করি। ওডেভ আর ওশরাতও আমাদের অনুসরণ করে।

বেরিয়ে আসি বাইরে, নেমে আসি মন্দির থেকে। এবারে বিদায়ের পালা। বিদেশী বন্ধুরা বিদায় নেবে।

মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের পরিচয়। তবু মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ থাকলে হত একসঙ্গে। কিন্তু ওরা যে গতকালই জৈনমন্দির দর্শন করেছে আর আজ দুপুরের বাস ধরে ওদের সাতনা চলে যেতে হবে।

গৌতম বলে, "আসুন, একটা ছবি নেওয়া যাক।"

ওডেভ সানন্দে বলে ওঠে, "ভাল কথা মনে করেছেন, আমিও যে আপনাদের একটা ছবি নেবো।"

ছবি তোলার পরে ঠিকানা বিনিময় হল। ওশরাত বলে, "দেশে ফিরতে

আমাদের আরও মাসদুয়েক লাগবে। তারপরে চিঠি দিও, খুশি হব—উত্তর দেব।”

“একটু বসা যাক্ এই গাছতলায়।” ওডেভ হঠাৎ প্রস্তাব করে।

তাহলে কি ওদের মনেও আমাদের জন্য কিছু ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছে? হতে পারে। ভালোবাসা যে সার্বজনীন।

সবাই এসে সেই গাছের গোড়ায় বসি। জানুয়ারী মাস, কিন্তু এমন চড়া রোদ যে বেশ গরম লাগছিল। ছায়ায় বসে ভারী ভাল লাগছে।

ওডেভই প্রথম কথা বলে, “আচ্ছা, পবিত্র মন্দিরে এইসব মিথুনমূর্তি কেন?”

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। এবং খাজুরাহো সম্পর্কে সবারই এটি প্রথম প্রশ্ন। পণ্ডিত ও গবেষকগণ এ প্রশ্ন নিয়ে বহু তর্ক করেছেন কিন্তু আজও কোন সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

ওডেভ বিদেশী পর্যটক। অথর্ববেদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তন্ত্রশাস্ত্র কিংবা ভারতীয় কামশাস্ত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। আমার ধারণাও না-থাকার মতই। তবু যখন একজন বিদেশী বন্ধু প্রশ্নটা করেছে, তখন একটা উত্তর দিতেই হবে। নইলে এদেশের ধর্ম সংস্কৃতি ও শিল্প সম্পর্কে বিকৃত ধারণা নিয়ে ওরা ঘরে ফিরবে।

অতএব বলতে শুরু করি, “হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম এবং পবিত্রতম গ্রন্থ হল বেদ। বেদ শুধু শাস্ত্র নয় সাহিত্যও বটে। বেদ চারখণ্ডে বিভক্ত—ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব। বৈদিক যুগ অর্থাৎ বেদ প্রণীত হবার পর থেকেই ভারতবাসীরা বিশ্বাস করে এসেছে যে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়েই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই বৈদিক-পরবর্তী-যুগে রতিক্রিয়া সম্পর্কে বহু শাস্ত্র প্রণীত হয়েছে। এমন কি প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কবি কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির কাব্যে পর্যন্ত আমরা বিশদভাবে কামশাস্ত্রের আলোচনা দেখতে পাই। বিশ্ব-প্রকৃতিতে কেউ একা নয়, সুতরাং কেউ একা থাকবে না। সবাই নিজ নিজ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলবে—এই মতবাদকে ভারতের সমাজ শাশ্বত সত্য বলে মেনে নিয়েছিল।

খাজুরাহের শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন সমাজকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, তেমনি তাঁরা জীবনকে অস্বীকার করেন নি। সেকালের সমাজজীবনের সর্বপ্রকার চিত্র তাঁরা মন্দিরগাত্রে খোদাই করেছেন। সুতরাং মৈথুনলীলাকে বাদ দিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারেন নি। সব চেয়ে বড় কথা এইসব মিথুনমূর্তি

তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটা মূল্যবান দিক। কারণ সেকালে ভোগের ভেতর দিয়েই ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হত। শিল্পীরা এইসব মূর্তি নির্মাণ করতে বাধ্য হয়েছেন কারণ তাঁর যুগ তাঁর কাছে এই দাবী করেছে, তাঁর সমাজ এই দাবীকে সমর্থন করেছে, তাঁর ধর্ম এই দাবীকে অনুমোদন করেছে। এবং কামসূত্র তাঁদের এই সব মূর্তি নির্মাণে উৎসাহিত করেছে।

অনেকে বলেন, দেবালয়ে প্রবেশের পূর্বে মনকে সংযত করবার জন্যও মিথুনমূর্তির প্রয়োজন আছে। এইসব উলঙ্গ ও সঙ্গমরত মূর্তি দর্শনের পরেও যাদের চিত্ত অবিকৃত থাকবে, তাঁরাই কেবল দেবদর্শনের অধিকারী। তাছাড়া তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে সঙ্গমরত মূর্তিগুলির বেশির ভাগ অতিশয় বিচিত্রভঙ্গীর কষ্টকর রতিক্রিয়া। এগুলি প্রকৃতপক্ষে যৌগিক প্রক্রিয়া অথবা তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন রূপ। চান্দেলা রাজারা অধিকাংশই কৌল-কাপালিক শৈব অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

একটু থেমে আবার বলি, "তোমরা আশা করি আমাদের দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং আন্তর্জাতিক ঔপন্যাসিক মুল্‌ক রাজ আনন্দ্‌-এর নাম শুনেছো?"

ওভেড মাথা নাড়ে। আমি বলি, "তিনি এ সম্পর্কে কি বলেছেন জানো?"

"না। কি বলেছেন?"

"বলেছেন, There is nowhere among the surviving erotic reliefs of Khajuraho any vulgarity if one brings to the sculptures the warmth of the heart rather than the old stare of obscene enquiry or the furtive gaze of a later, more cynical and weary, age. Whether it is the withdrawn look on the faces of the modest women attendants, helping in the ceremonies of love, or the unselfconscious embraces of mithuna couples, the bodies of the persons involved are like graceful curves of those in whom passion has become incarnate···Seldom do the faces reflect mere animal lust, as though the artisan always remembered the spiritual values of which the necked physical connection was merely the expression.' *

---

* 'Homage to Khajuraho'

আমি শেষ করতেই ওডেড আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি হচ্ছে আমাদেরও। এখনও অনেক মন্দির দেখা বাকি।

আমরাও উঠে দাঁড়াই। চৌকিদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি। পাশাপাশি এগিয়ে চলি বড় রাস্তার দিকে।

ওডেড সাইকেলে ওঠে, ওশরাত পেছনে চড়ে বসে। সাইকেল চলতে শুরু করে। ওশরাত হাত নাড়ে। আমরা হাত নাড়ি।

ওডেড বলে, "তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দ পেলাম, তোমাদের ধন্যবাদ। বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

আমরাও সমস্বরে বলি, "ধন্যবাদ। বিদায়, বন্ধু বিদায়।"

ওশরাত বলে, "কেবল একটা আপসোস রয়ে গেল।"

"কি?" প্রশ্ন করি।

ওশরাত উত্তর দেয়, "আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।"

আমাকে এবারেও নিরুত্তর থাকতে হয়। সাইকেল এগিয়ে চলেছে।

ওশরাত এখনও তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে—সে যে তার প্রশ্নের উত্তর পায় নি।

## ॥ আট ॥

পথের বাঁকে সাইকেলটি অদৃশ্য হল, ওশরাত হারিয়ে গেল।

না। সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। এই ইহুদী মেয়েটির কথা বহুদিন মনে থাকবে আমার, মনে পড়বে তার সেই সকরুণ জিজ্ঞাসা। আমি উত্তর দিতে পারি নি। নিরুত্তর থাকার যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে আমাকে, সইতে হবে কিছুদিন।

কিন্তু আমি যে পথিক। চোখের জলে পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠলেও আমাকে পথ চলতে হবে। অতএব চোখ মুছে এগিয়ে চলি।

যে-পথের বাঁকে ওশরাত আর ওডেড মিলিয়ে গেল, সেই পথ দিয়েই বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন আমরা জৈন-মন্দিরে যাচ্ছি।

দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সোজাসুজি সামনে—খানিকটা উঁচুতে। পুবদিকে, সামান্য দূরে। একটি নয়, কয়েকটি মন্দির। তবে একটি শিখর সবার ওপরে মাথা উঁচু করে আছে। ওটাই পার্শ্বনাথ মন্দির।

আমাদের বাঁয়ে খাজুরাহো গ্রাম। সেই গ্রাম ও গ্রামের উপকণ্ঠে ব্রহ্মা, বামন ও জাওয়ারী নামে তিনটি হিন্দুমন্দির এবং ঘণ্টাই নামে একটি ভগ্ন জৈন মন্দির আছে। আর এখানে রয়েছে তিনটি বড় জৈন মন্দির—পার্শ্বনাথ, আদিনাথ ও শান্তিনাথ। এই সাতটি মন্দির নিয়ে খাজুরাহের পূর্ব-মন্দির গোষ্ঠী বা Eastern group of temples.

আট-দশ ফুট ওপরে উঠে এসে পথটা একফালি সমতলের সঙ্গে মিলিত হল। এই সমতল জায়গাটুকুকে মন্দিরের বহিরাঙ্গণ বলা যেতে পারে। এখানে কয়েকখানি দামী মোটর ও একখানি লাক্সারী বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভক্তরা জৈন মন্দির দর্শনে এসেছেন। জৈনরা আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী সম্প্রদায়।

সু উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত সুবিরাট এলাকা নিয়ে জৈন মন্দিরগোষ্ঠী। সামনে সুবিশাল তোরণ। হালে তৈরি। তোরণের পাশে কয়েকটি পুতুল ও একটি খাবারের দোকান এবং মন্দির কমিটির অফিস।

ভেতরে আসি। তোরণের দুদিকে ধর্মশালা—বারান্দাযুক্ত সারি সারি ঘর। বহু ভক্ত সপরিবারে দর্শনে এসেছেন। তাঁরা স্নান-খাওয়ায় ব্যস্ত রয়েছেন। সারা মন্দির এলাকাটি ইট অথবা পাথর দিয়ে বাঁধানো। তারই মাঝে একফালি বাগান।

বাগানকে পেছনে রেখে বাঁধানো চত্বর দিয়ে বাঁদিকে এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই ডানদিকে মন্দিরদ্বার—শান্তিনাথের মন্দির। এখন এখানে কেবল এই মন্দিরেই দৈনিক পূজা হয়।

মন্দিরদ্বারের দু-পাশে দুটি উপবিষ্ট সিংহমূর্তি। আমরা ভেতরে আসি। বাঁধানো অঙ্গন। তিনদিকে ছোট ছোট মন্দিরের সারি আর একদিকে মূল মন্দির।

মূল মন্দিরের সামনে আসি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। মন্দিরে পুজোর উপকরণ আর ষোড়শ জৈনতীর্থঙ্কর শান্তিনাথের বিগ্রহ। সাড়ে চার মিটার দীর্ঘ বিশাল বিগ্রহ. বিগ্রহের বেদিতে বৃষমূর্তি খোদিত রয়েছে। তাই অনেকের মতে এটি প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর ঋষভদেব বা বৃষভদেবের মন্দির, শান্তিনাথের নয়।

কিছুকাল আগে এই মন্দিরটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ফলে এর প্রাচীনত্বের বড়াই ঘুচেছে। কিন্তু বিগ্রহটি সুপ্রাচীন। কানিংহ্যামের মতে ১০২৭/২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। আমরা প্রণাম করি।

তারপরে দু-পাশের ছোট ছোট মন্দিরগুলি দর্শন শুরু করি। ডানদিকে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দির। নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। তাঁর মূর্তিটি শ্বেতপাথরের। কিন্তু এ মন্দিরে কষ্টিপাথর ও পেতলে তৈরি অন্যান্য কয়েকজন তীর্থঙ্করের মূর্তিও রয়েছে। আমরা দর্শন করি।

বাঁদিকের একখানি ঘরে দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথের মন্দির। ভেতরে শীতলনাথের ছোট দণ্ডায়মান বিগ্রহ। তাঁর দু-পাশে অন্যান্য তীর্থঙ্করদের কয়েকটি মূর্তিও রয়েছে।

প্রণাম করে বেরিয়ে আসি শান্তিনাথ মন্দির থেকে। বাঁদিকে কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকের পথ ধরি। শান্তিনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে আমরা পেছনদিকে চলেছি।

বেশিদূর এগোতে হয় না। শান্তিনাথ মন্দির ছাড়িয়েই বাঁদিকে ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মন্দির। ইক্ষাকু বংশীয় কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র পার্শ্বনাথ। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে বারাণসী ধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম পুরীসুধন্য বা জনপ্রিয়। তিনি কুশস্থলরাজ নরবর্মনের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই রাজা প্রসেনজিৎ।

পার্শ্বনাথ তিরিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সংসার ত্যাগের কাহিনীটি বড়ই বিচিত্র। তিনি 'বিশাল' নামে একখানি পালঙ্কে বারাণসী পরিক্রমা করেন। তারপরে আশ্রমপদ উদ্যানে সাড়ে তিন দিন উপবাসী থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি তিরাশি দিন তপস্যা করে 'কেবল' বা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পার্শ্বনাথ পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের উপদেশামৃত সংকলন করেন এবং তাঁর মতবাদকে নিগ্রন্থিধর্ম বলে ঘোষণা করেন। সংঘ ধর্মে পরিণত হয়।

একশ বছর বয়সে এক শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে ( শ্রাবণী নক্ষত্রে ) তিরাশীজন শিষ্য পরিবৃত অবস্থায় সমেদশিখরে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম অনুসারেই বিহারের ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছে পরেশনাথ পাহাড়।

৬৮'২" ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩৪'১১" ইঞ্চি প্রশস্ত এই পার্শ্বনাথ মন্দিরটি খাজুরাহের বৃহত্তম জৈন মন্দির। ভারতের একটি সব চেয়ে সুন্দর মন্দিরও বটে।

চারিদিকে ছোট বড় নতুন ও পুরনো মন্দির। তারই মাঝে একফালি বাঁধানো আঙিনা। সেখানে বসে কয়েকজন বয়স্ক বিদেশী পর্যটক বিশ্রাম করছেন। তাঁরা জার্মান ভাষায় তাঁদের গাইডের সঙ্গে গল্প করছেন। বোধ করি

এঁদের মন্দির দর্শন শেষ কিন্তু দলের তরুণ-তরুণীরা ছবি তুলছেন বলে অপেক্ষাকৃত অশক্তরা এখানে তাঁদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কি করবেন? খাজুরাহো যে ক্যামেরাম্যানদের স্বর্গ!

অঙ্গন থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে আসি মন্দিরচত্বরে। খাজুরাহের প্রায় সব মন্দিরের চারিপাশেই এমন উঁচু চত্বর রয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে এটাই মন্দিরের ভিৎ। স্থপতিদের ভাষায় জগতী (Platform)।

ভাবলে অবাক হতে হয়, এটি বৈষ্ণব কিংবা শৈব মন্দির নয়, জৈন মন্দির। মন্দিরগাত্রে ঠিক তেমনি তিনসারি মূর্তিমালা আর তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু দেব-দেবী মূর্তি। গঠনপ্রণালীও একই রকম। অবশ্য অনেকে বলেন, সেকালের জৈনরা প্রায় সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীকেই নিজেদের দেব-দেবী বলে মনে করতেন।

পূর্বমুখী মন্দির। সামনে সুদৃশ্য তোরণ। ভেতরে তিনটি ভাগ—মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। এ মন্দিরের অবশ্য একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, এখানে দুটি গর্ভগৃহ রয়েছে।

কিন্তু গর্ভগৃহের কথা পরে ভাবা যাবে। আগে বাইরেটা ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।

বহু শিখর সমন্বিত সুউচ্চ মন্দির। মূল শিখরটি যেমন উঁচু তেমনি সুন্দর।

তিনসারি মূর্তিমালার নিচের সারিতে সব চেয়ে বড় বড় মূর্তি। ওপরের সারির মূর্তিগুলি সব চেয়ে ছোট। এঁদের মধ্যে যেমন হিন্দু দেব-দেবী ও জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুরসুন্দরী ও মিথুনমূর্তি।

পূবদিকের দেওয়ালে যে মূর্তিটি আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করল, সেটি অগ্নিমূর্তি। স্বর্গের দেবতা হলেও বৈশ্বানরের মুখভর্তি মানুষের মতো লম্বা লম্বা দাড়ি। তাঁর চোখেও মানুষের দৃষ্টি। ভারী সুন্দর মূর্তি।

অগ্নিদেবের পরেই একদিকের দেওয়ালে নজর পড়ে দুজন সুরসুন্দরীর দিকে। একজন প্রসাধনরতা। ডান হাতে একটি তুলি নিয়ে সে ডান চোখে কাজল পড়ছে। আরেকজন পায়ের কাঁটা তুলছে। দুজনেরই দেহে অপরূপ স্বাস্থ্য, মুখে স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর চোখে গ্রাম্য সরলতা। প্রথম মূর্তিটিকে দেখে মনে হয় সে এখুনি অভিসারে বের হবে। আর দ্বিতীয়টি বোধ করি বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। ফেরার পথে পায়ে কাঁটা ফুটেছে। তাই বনপথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গিতে সে পায়ের কাঁটা তুলছে। এই মূর্তিটি সম্পর্কে

মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক গবেষক বলেছেন, 'This plump girl is a study of the sculptor's art of highest level.'

উত্তরগাত্রে নন্দী ও শিবের মূর্তি দুটি বড় ভাল লাগে। আর এই মন্দিরের পশ্চিমগাত্রে নিচের সারিতে রয়েছে সেই পত্রলেখা সুরসুন্দরী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দয়িতের কাছে প্রেমপত্র রচনা করছে বিরহিণী প্রিয়া।

নিচের সারিতে আরেকজন সুরসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে বেলা বয়ে গিয়েছে। সহসা মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা কানে এসে পৌঁছল। সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গিয়েছে। দেবদাসী তাই তাড়াতাড়ি ঘুঙুর পড়ছে পায়ে।

এবারে এসে দাঁড়াই হর-পার্বতীর সেই বিখ্যাত যুগলমূর্তির সামনে। এমন কোমল ও প্রাণময় শিব-শক্তির মূর্তি নাকি এখানে কোন হিন্দু মন্দিরেও নেই।

উমাপতি পরম রক্ষকের মতো পার্বতীকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। উমার হাতে একখানি আরশি। বোধ হয় তিনি কবরী রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় ব্যোমকেশের আগমন ঘটেছে। তাহলেও তিনি কিন্তু মোটেই বিরক্ত নন। তাঁর হাতের আরশি হাতেই রয়ে গিয়েছে। তিনি মহানন্দে মহাদেবের বক্ষলগ্না। তাঁর চোখে-মুখে আত্মসমর্পণের প্রশান্তি।

উভয়ে উভয়কেই গ্রহণ করেছেন পরম আপন বলে। পাথরের দেব-দেবীর দেহে রক্তমাংসের নর-নারীর সহজাত আকর্ষণকে মূর্ত করে তুলেছেন খাজুরাহের নাম-না-জানা অমর শিল্পী।

আরও বহু দর্শনীয় শৈব ও বৈষ্ণব মূর্তি রয়েছে এই জৈন মন্দিরে। তাঁদের মধ্যে পরশুরাম, রেবতী-বলরাম, রাম-সীতা ও হনুমান, কাম-রতি, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং কয়েকজন সুরসুন্দরীর মূর্তি অবিস্মরণীয়।

মজার মূর্তিও আছে। যেমন—দুই সতীন চুলোচুলি করছিল। এমন সময় তাদের পতিদেবতা এসে অবলাদের থামতে বলায়, সতীসাধ্বীদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মিনসের ওপরে। সতীনের চুল ছেড়ে দিয়ে একজন সহধর্মিণী স্বামীর দাড়ি ধরেছে, আরেকজন পরম গুরুকে উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

প্রদক্ষিণ শেষে আবার ফিরে আসি মন্দিরতোরণে। নয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরে। তোরণের সিলিঙে অপূর্বসুন্দর ফুল ও লতাপাতা খোদাই করা। আর রয়েছে কয়েকটি উড়ন্ত বিদ্যাধরের অপরূপ মূর্তি।

মণ্ডপে প্রবেশ করি। দরজার মাঝখানে গরুড়ের পিঠে সমাসীনা চক্রেশ্বরী যক্ষীর দশভুজা মূর্তিটি সত্যই দেখার মতো।

এগিয়ে চলি। গর্ভমন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়াই। এখানে কিন্তু আর যক্ষী নয়, জীন—স্বয়ং মহাবীর। একটি নয়, বেশ কয়েকটি মূর্তি। তবে গর্ভগৃহের দেওয়ালে তীর্থঙ্করদের মূর্তির মাঝে মাঝে নৃত্যের ভঙ্গীতে কয়েকজন সুরসুন্দরী রয়েছে দাঁড়িয়ে।

মূল বিগ্রহ কষ্টিপাথরের। পার্শ্বনাথের উপবিষ্ট অপরূপ বিগ্রহ। আমরা প্রণাম করি।

দর্শন-শেষে বেরিয়ে আসি বাইরে। মন্দির থেকে নেমে এসে বাঁদিকে হাঁটতে থাকি। পার্শ্বনাথ মন্দিরের উত্তর দিকে আদিনাথের প্রাচীন মন্দির। আমরা এখন সেই মন্দিরে চলেছি।

হঠাৎ রণজিৎ প্রশ্ন করে, "পার্শ্বনাথ মন্দির কবে তৈরি হয়েছে?"

"৯৫০ থেকে ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, চান্দেলারাজ ঢঙ্গের রাজত্বকালে।" উত্তর দিই, "তবে অনেকের মতে আগে এ মন্দিরে আদিনাথের বিগ্রহ ছিল, আর তাই বিগ্রহের বেদিতে বৃষমূর্তি খোদিত রয়েছে। যে কোন কারণেই হোক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময় পার্শ্বনাথের বর্তমান বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৬৫ সালে কানিংহ্যাম এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখেন নি। অর্থাৎ তার আগেই বৃষভদেবের মূল বিগ্রহটি অপসারিত হয়েছিল।

"প্রখ্যাত পণ্ডিত ফার্গুসান অবশ্য বলেছেন, এটি নাকি বৈ...ব মন্দির রূপেই নির্মিত হয়েছিল। পরে জৈন মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত সত্য নাও হতে পারে। মন্দিরতোরণে যে শিলালিপি দেখে এলি, তা থেকে জানা যায়, পাহিল নামে মহারাজা ঢঙ্গের জনৈক জৈন বন্ধু তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এ মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢঙ্গ পাহিলকে কয়েকটি বাগান দান করেছিলেন। পাহিল ঋষভদেবের ভক্ত ছিলেন। এই শিলালিপি থেকে চান্দেলা রাজাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তখন বোধ হয় এ মন্দিরের নাম ছিল জীন মন্দির। জীন শব্দের প্রকৃত অর্থ জৈন। ২৫তম তীর্থঙ্কর মহাবীর নিগ্রন্থি ধর্মাবলম্বীদের সংঘকে জীন বা জৈন ধর্ম বলে প্রচার করেন। যাক্ গে সে কথা, আসল কথা এই মন্দিরের নামের সঙ্গে পার্শ্বনাথ শব্দটি সম্ভবত গত শতকের শেষদিকে যুক্ত হয়েছে।"

পায়ে চলা বাঁধানো পথটি পেরিয়ে আমরা আদিনাথ মন্দিরের সামনে এসে

উপস্থিত হয়েছি। মনে হচ্ছে মন্দিরটি আরও বড় ছিল। কোন কারণে সামনের অংশটি ধ্বংস হয়ে কেবল গর্ভমন্দিরটি অক্ষত ছিল। ইদানীংকালে তার সঙ্গে একটি অর্ধমণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে।

এ মন্দিরের বাইরেও তিনসারি মূর্তিমালা। অধিকাংশই হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। কয়েকটি অপরূপা সুরসুন্দরীর মূর্তি রয়েছে মন্দিরগাত্রে। বিচিত্রসুন্দর তাদের দেহের গঠন এবং ভঙ্গি। অনিন্দ্যসুন্দর তাদের মুখমণ্ডল। তারা কেউ দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে, কেউ এক হাত মাথায় রেখে দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বা পেছন ফিরে শুধু মুখখানি এদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। কেউ প্রসাধনরতা, কেউ নৃত্যরতা, আবার কোনটি বা সঙ্গমরত নারী-পুরুষের যুগলমূর্তি। বিষয় এবং ভঙ্গিমা ভিন্ন হলেও ভাবখানি অভিন্ন। এদের সবার মুখে মর্ত্যের মাধুর্য আর স্বর্গের শান্তি।

শুধু মানুষ আর দেবতা নয়, জন্তু-জানোয়ার বিশেষ করে ড্রাগনের কয়েকটি দর্শনীয় মূর্তি রয়েছে এ মন্দিরে।

প্রদক্ষিণ-শেষে মন্দিরে প্রবেশ করি। জনৈকা চতুর্ভুজ জৈন দেবীমূর্তি রয়েছে মন্দিরদ্বারে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আরও কয়েকজন জৈন দেবদেবী বিভিন্ন বাহনে চড়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন। বিস্মিত হই, জৈন দেবতারাও যুদ্ধে চলেছেন!

গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের আদিনাথ বিগ্রহ। তাঁর পাশে কয়েকজন জৈন যক্ষীর মূর্তি। আর মন্দিরগাত্রে রয়েছে অপরূপ খোদাই কাজ। আমরা দর্শন করি—প্রণাম করি।

আগেই বলেছি পার্শ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট জৈন মন্দির আছে। এগুলি নূতন হলেও প্রায় সবই নাকি প্রাচীন মন্দিরের বেদিমূলে নির্মিত।

দর্শন-শেষে বেরিয়ে আসি বাইরে, সামনের সেই সমতল বহিরাঙ্গণে। রণজিৎ বলে বসে, "রেস্তোরাঁটা তো ভালই মনে হচ্ছে, একটু চা খেয়ে নিলে হতো না?"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অতএব চায়ের দোকানে এসে বসা গেল।

## ॥ নয় ॥

গরম চা ও ঠাণ্ডা নিমকি খেয়ে বেরিয়ে আসি পার্শ্বনাথ কাফে থেকে। সমতল মন্দিরাঙ্গণ পেরিয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলি ঢালু পথে।

সমতলে পৌঁছে আরও কিছুক্ষণ হাঁটতে হল পুরনো পাকা রাস্তায়। তারপরে ডাইনের পায়ে চলা পথ ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি খাজুবাহো গাঁয়ের দিকে।

পার্শ্বনাথ মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছলাম ঘণ্টাই মন্দিরের সামনে। বলছি মন্দির কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কেবল কয়েকটি স্তম্ভ ও একফালি ছাদ। আর কিছু নেই।

কিন্তু যা আছে, যতটুকু আছে, তারই দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটি মন্দিরতোরণ ও মহামণ্ডপের অংশ। প্রতি অংশে চারটি করে কারুকার্যময় স্তম্ভ ও ছাদ। অপরূপ খোদাই কাজ। প্রত্যেক স্তম্ভের চারিপাশে কীর্তিমুখ। আর সেই মুখমণ্ডল থেকে পাথরের ওপর খোদাই করা মণি-মুক্তার মালার সঙ্গে ঘণ্টা ঝুলছে। অনেক ঘণ্টা। আর তাই এ ভগ্নাবশেষের বর্তমান নাম ঘণ্টাই মন্দির।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই মন্দিরের গড়ন অবিকল ছিল পার্শ্বনাথ মন্দিরের মতো, কিন্তু এটি আকারে পার্শ্বনাথ মন্দিরের দ্বিগুণ ছিল। আর কারুকার্য যে উন্নতমানের ছিল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। শিল্পীর সার্থক স্বপ্ন আজও খোদিত রয়েছে এই ভগ্নাবশেষের প্রাত স্তরে। সাম্রাজ্যলোভী মানুষ কিংবা মহাকাল সেই স্বপ্নসুন্দর শিল্পকলাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে সক্ষম হয় নি।

হঠাৎ গৌতম প্রশ্ন করে, "এটা কি হিন্দু মন্দির ছিল ঘোষদা?"

"না।" আমি উত্তর দিই, "কানিংহ্যাম এখানে একটি বুদ্ধমূর্তি পেয়ে, প্রথমে একে বৌদ্ধ মন্দির রূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এখানে এগারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওপরদিকে তাকিয়ে দেখো গরুড়ে সমাসীনা অষ্টভুজা যক্ষ-চক্রেশ্বরী খোদিত রয়েছে। মহাবীর গর্ভে আসার পরে তাঁর মাতৃদেবী যে ষোড়শ স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার পবিত্র প্রতীকও খোদাই করা রয়েছে এখানে। সুতরাং এটি একটি দিগম্বর জৈন মন্দির ছিল। নির্মাণকাল সম্ভবত ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।"

"আচ্ছা, সেই এগারোটি জৈন মূর্তি তো দেখতে পাচ্ছি না?" আমি থামতেই রণজিৎ জিজ্ঞেস করে।

"পাবে কেমন করে, সে, সি এখান থেকে কোন মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে ফেলে রাখলে তো কিউরিও হাণ্টারদের কুক্ষিগত হত।"

কথাটা ঠিকই বলেছে গৌতম। কিন্তু আর কথা নয়, এবারে এগোনো যাক। তেমনি কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথে এগিয়ে চলি।

পায়ে চলা পথটি এসে গাঁয়ের মূল পথে মিলিত হল। আর এখানেই পথের বাঁদিকে বিশাল জলা। জল সামান্য, জলজ গাছই বেশি। অনেকটা মজে যাওয়া বিলের মতো। কিন্তু এরই নাম নিনোরাতাল কিংবা খাজুরাহো সাগর। কি জানি, সেকালে হয়তো এই জলাশয় সাগরের মতই সুগভীর ছিল।

খাজুরাহো সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রহ্মামন্দির। অবস্থানটি চমৎকার হলেও খুবই ছোট মন্দির। তারই সামনে এসে আমাদের পথ চলার সাময়িক বিরতি ঘটেছে।

একটি শিখরযুক্ত ক্ষুদ্র মন্দির। পিরামিড আকারের শিখর। ছোট অন্তরাল ও গর্ভগৃহ নিয়ে চৌকোণা মন্দির। পূর্বমুখী মন্দির তবে পশ্চিম দিকেও একটি দরজা আছে। আর উত্তর-দক্ষিণে পাথর কেটে দুটি জানলা। গবেষকগণ অনুমান করেন ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

"অনেকের মতে এটি প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুমন্দির, কারণ গর্ভগৃহের দ্বারে বিষ্ণুমূর্তি খোদিত রয়েছে।

বলা বাহুল্য তাঁদের মত সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেন নি। কারণ মন্দিরের মূল বিগ্রহ চতুর্মুখী ব্রহ্মার লিঙ্গমূর্তি। বিগ্রহের বেদিতে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি খোদিত। আর তাই এ মন্দির আজও ব্রহ্মামন্দির নামেই সুপরিচিত।

আবার শুরু হল পথ চলা। কয়েক পা এগিয়েই আমরা খাজুরাহো গ্রামে প্রবেশ করি।

না। গ্রাম নয়, বস্তি। ছায়া-সুনিবিড় ছোট ছোট বাড়ি নিয়ে ছবির মতো গ্রাম নয়, সংকীর্ণ পথের দু-পাশে জরাজীর্ণ খোলার ঘরের সারি। একটিও পাকাবাড়ি চোখে পড়ছে না। কেবল দেখছি ছিন্ন পোশাক পরিহিত সর্বহারা নরনারী ও ভগ্নস্বাস্থ্য উলঙ্গ শিশুর দল।

দেখতে দেখতে পথ চলেছি আর চলতে চলতে ভাবছি—গ্রামের নাম খাজুরাহো। ভারতের গৌরব এবং বিশ্ববিখ্যাত নাম। অথচ সেই গ্রামের মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত উক্তি আজও মিথ্যে হয়ে যায় নি—'সত্যই সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!'

গাঁয়ের বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে আবার মাঠে নামতে হল। এটি খাজুরাহো গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিক। সেই পায়ে-চলা মেঠো পথ। পথের পাশে পাশে শর্ষে ক্ষেত। প্রচুর ফুল ফুটেছে—শর্ষে ফুল। অর্থাৎ আমরা চোখে শর্ষেফুল দেখছি। খারাপ লাগছে না মোটেই। বরং বলব ভাল লাগছে। সত্যি সুন্দর ফুল। এমন ফুলের নামে কে অমন দুর্নাম রটালো?

মাঠের মাঝে মন্দির—জাওয়ারী মন্দির। জাওয়ারী মানে বিষ্ণু। তেমনি চারিদিকে তারকাঁটার বেড়া আর লোহার গেট। আমরা গেট ঠেলে ভেতরে আসি।

চৌকিদার সেলাম করে। মনে হচ্ছে মানুষটি আমাদের দেখে খুশি হয়েছে। হবারই কথা। হয়তো সে সকাল থেকে এতক্ষণ একা একা বসে আছে। ট্যুরিস্টদের এক-শতাংশও এখানে আসে কিনা সন্দেহ। সবাই সাধারণত ওয়েস্টার্ণ গ্রুপ ও জৈন মন্দির দেখে ফেরার বাস কিংবা বিমান ধরেন। অথচ আমরা তার মন্দির দেখতে এসেছি। সুতরাং সে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বরণ করল আমাদের।

মন্দিরের জগতী বেশ উঁচু। ষোল ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওরে। গড়নটি অবিকল চতুর্ভুজ মন্দিরের মতো। চারিদিকে তেমনি বাঁধানো অঙ্গন ও বাইরের দেওয়ালে তিনসারি মূর্তিমালা। তবে ছোট মন্দির এবং উত্তরমুখী।

ছোট হলেও ভারী সুন্দর। যেমন গঠন, তেমনি ভাস্কর্য। ডঃ বিদ্যা প্রকাশ বলেছেন, 'It is a gem of architecture for its remarkable proportions… *

চৌকিদারের সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করি। উল্লেখযোগ্য মূর্তিগুলো চৌকিদার দেখিয়ে দেয় আগে আগে। উত্তরগাত্রে রয়েছে হর-পার্বতী ও ব্রহ্মা-সরস্বতীর স্মরণীয় মূর্তি। রয়েছে মা ও ছেলের মূর্তি—মা ছেলেকে স্তন্যদান করছে। রয়েছে কয়েকজন সুরসুন্দরী এবং কয়েকজোড়া মিথুনমূর্তি।

জনৈকা সুরসুন্দরীকে তার পরিচারিকা প্রসাধনে সাহায্য করছে। খাজুরাহের মন্দিরশিল্পে অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্তি গড়ে পরিচারক-পরিচারিকাদের বোঝানো হয়েছে।

পশ্চিম দিকের দেওয়ালে হর-পার্বতী এবং ত্রিমুখী-বিষ্ণুর মূর্তি দুটি দেখার

---

* 'Khajuraho'

মতো। একগুচ্ছ ফুল হাতে নিয়ে একজন সুরসুন্দরী যেন কোথায় চলেছে! বোধ হয় অভিসারে।

নন্দীভগবানের একটি বিচিত্র মূর্তি রয়েছে এই দেওয়ালে। নন্দীর মুখখানি গরুর কিন্তু দেহটি মানুষের।

আমরা দক্ষিণ দিকে আসি। প্রথম নজর পড়ল নৃসিংহ অবতারের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটির দিকে। ত্রিমুখী ব্রহ্মার আরেকটি মূর্তি রয়েছে এদিকে। রয়েছেন পার্বতী, অগ্নি ও লক্ষ্মীনারায়ণ। আর আছে বিভিন্ন বিচিত্র ভঙ্গিতে সঙ্গমরত কয়েকজোড়া নারী-পুরুষের মূর্তি।

পূর্ব দিক দেখে আমরা আবার ফিরে আসি উত্তরে। নয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মকরতোরণে। অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপের সিলিঙে অপরূপ খোদাই কাজ। চেয়ে থাকবার মতো।

কিন্তু আমরা তো সৌন্দর্যের পূজারী নই, আমরা পর্যটক, আমরা ট্যুরিস্ট্। অতএব এগিয়ে আসি গর্ভমন্দিরের দ্বারে। দরজার ওপরদিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি। তাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মিথুনমূর্তি।

গর্ভগৃহে চতুর্দেহী বিষ্ণু বিগ্রহ। কিন্তু বিগ্রহের মাথা এবং হাত নেই। ভেঙে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, বোধ করি কেউ ভেঙে ফেলেছে।

কে? কোন পরধর্মদ্বেষী সম্রাট? হয়তো হবে।

আমরা তবু প্রণাম করি। না, না, শক্তিমদে মত্ত সম্রাটকে নয়, মানুষের ভগবানকে—তাঁর ভগ্নমূর্তিকে। মন্দির ভেঙে ধর্ম ধ্বংস করা যায় না। মূর্তি ভাঙলেই ভক্তির ধারা শুকিয়ে যায় না। মানুষের ভগবান বেঁচে থাকেন মানুষের অন্তরে।

উত্তর দিকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি মন্দির। ওটিও বৈষ্ণব মন্দির। নাম বামন মন্দির। মন্দিরটি জাওয়ারীর চেয়ে কিছু বড়।

মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলেছি বামন মন্দিরের দিকে। বিষ্ণুর অবতার বামন। জগতে যখন পাপের বোঝা পূর্ণ হয়, তখুনি ভগবান সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত আবির্ভূত হন। 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার। তাঁদের মধ্যে দশটি অবতার সুপ্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর সেই দশাবতারের মধ্যে বামন পঞ্চম অবতার। মহাকবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে গেয়েছেন—

'ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত—বামন।
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাবন॥
কেশব ধৃত-বামন-রূপ
জয় জগদীশ হরে॥'

অন্যান্য অবতারগণ হলেন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। অবশ্য সব পুরাণের দশাবতার এক নয়। এবং ব্রহ্মা, নারদ, কপিল, বেদব্যাস ও ঋষভদেব প্রভৃতিও বিষ্ণুর অবতার।

কিন্তু অন্যান্য অবতারদের কথা থাক, আমরা বামন মন্দিরে চলেছি। অতএব বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ বামনদেবের কথাই ভাবা যাক।

চতুর্থ অবতার নৃসিংহদেবের স্নেহধন্য প্রহ্লাদের পৌত্র হলেন বলি। তিনি ছিলেন অতিশয় দানশীল ও ধার্মিক। তিনি পরমপ্রেমিক প্রজাপালক ও সুশাসক ছিলেন। বলি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না। তাঁর দান-ধর্মে প্রীত হয়ে ভগবান তাঁকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করলেন।

ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করে বলির বড়ই গর্ব হল। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতে শুরু করলেন।

দেবতারা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে এলেন। বললেন—বলির গর্ব খর্ব করুন। নইলে ত্রিভুবন রসাতলে যাবে।

বিষ্ণু তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তিনি কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্ম নিলেন। যথাসময়ে বামনের উপনয়ন হল।

উপনয়নের পরে ব্রাহ্মণ বামন বলির রাজসভায় এলেন। তিনি রাজার কাছে দান চাইলেন।

খর্বকায় বামনকে প্রার্থী রূপে উপস্থিত দেখে বলি বড় মজা পেলেন। তিনি সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—দ্বিজ, তোমার কি প্রয়োজন?

বামন উত্তর দিলেন—মহারাজ, আপনি আমাকে 'ত্রিপদপরিমিত ভূমি' দান করুন। আমি সেখানে 'ছত্রদণ্ড স্থাপন' করে তপস্যায় বসব।

বলি হেসে বললেন—এত সামান্য দান আমার পক্ষে হাস্যকর। তুমি কোন নগর কিংবা কয়েকখানি গ্রাম প্রার্থনা কর।

বামন উত্তর দিলেন—না, মহারাজ। তিন-পা জায়গার চেয়ে বেশি আমার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে তিন-পা জায়গা দিন।

রাজা আবার একটু হেসে বললেন—তথাস্তু। তারপরে তিনি জল হাতে নিয়ে দানের জন্য প্রস্তুত হলেন।

দৈত্যগুরু বিচক্ষণ শুক্রাচার্য প্রমাদ গনলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাজাকে সাবধান করে কানে কানে জানালেন—মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, এই বামন সাধারণ ব্রাহ্মণ বালক নয়, স্বয়ং নারায়ণ।

দানশীল বলি সে পরামর্শ উপেক্ষা করে বললেন—এ বালক যে-ই হোক, আমি যখন বলেছি একে তিন-পা জায়গা দেব, তখন সে দান করবই।

বলি বামনকে তিন-পা জায়গা দান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সহসা খর্বকায় বামন বিশাল রূপ ধারণ করলেন। তিনি এক পা স্বর্গে ও অপর পা মর্ত্যে রাখলেন। তারপরে নাভিদেশ থেকে আরেকখানি পা বের করে বলিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানি কোথায় রাখব?

দানবীর বলি করজোড়ে বললেন—ভগবান, আমার গর্ব খর্ব হয়েছে। আপনি আমার মস্তকে আপনার পবিত্র পদ স্থাপন করুন।

ভগবান তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। ঋগ্‌বেদের ভাষায়—'ত্রেধা নিদধে পদম্।' তিনি তিন ভুবনে তিনখানি পা রাখলেন।

কিন্তু তিনি বলির দানশীলতায় সন্তুষ্ট হলেন। আর তাই তাঁকে পাতাল দান করে সেখানে সুখে রাজত্ব করার অনুমতি দিলেন। বললেন—আমি আজ থেকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে তোমার প্রাসাদদ্বারে দ্বারী হয়ে থাকব।

বামন অবতার রূপে ভগবান দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ করেছিলেন। আমরা এখন সেই বামন মন্দির দর্শন করতে চলেছি।

পৌঁছে গিয়েছি বামন মন্দিরের সামনে। মন্দিরটির একদিকে একখানি বাড়ি আর তিনদিকে ক্ষেত। সেই বাড়ির ভেতর দিয়েই লোহার গেটের সামনে এলাম। চৌকিদার তেমনি সহাস্য স্বাগত জানায়।

ষোল ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি জগতীর ওপরে। অনেকখানি খালি জায়গা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে এখানেই ছিল মূল তোরণ। ভেঙে গিয়েছে? কিংবা ভেঙে ফেলা হয়েছে? কে জানে?

একটি শিখর। কিন্তু গড়নটা চৈত্যবিহারের মতো। গর্ভগৃহটি সপ্তরথের ঢঙে নির্মিত। মন্দিরটি ৬২ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ, ৪৫ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত।

বাইরের দেওয়ালে দু'সারি মূর্তিমালা। সব চেয়ে বিস্ময়কর এ মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে কোন মিথুনমূর্তি নেই। এর একটি কারণ সম্ভবত এই

যে এটি পরবর্তীকালের মন্দির। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন এ মন্দিরের নির্মাণকাল ১০৫০ থেকে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রদক্ষিণ শুরু করি। অপরূপ মূর্তিমালা। তবে বহু মূর্তি ভাঙা। কিন্তু দেব-দেবী ও সুরসুন্দরীদের মধ্যে যাঁরা অক্ষত রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই চেয়ে দেখার মতো। যেমন এই উত্তরদিকের দেওয়ালে রয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণের অপরূপ যুগলমূর্তি।

পশ্চিমদিকে রয়েছে ব্রহ্মা ও কয়েকজন সুরসুন্দরীদের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। রয়েছে হর-গৌরীর বিবাহবাসরের অভিনব মূর্তিসমষ্টি।

দক্ষিণদিকে আসি। এ-দেওয়ালে ব্রহ্মা ও সরস্বতীর যুগলমূর্তি এবং কয়েকজন সুরসুন্দরী সত্যই দর্শনীয়। তবে সুরসুন্দরীদের কেশবিন্যাস ও বেশবাস কিছু সরল ও অনাড়ম্বর। জনৈকা সুরসুন্দরী মনোহর নৃত্যের ভঙ্গিমায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আরেক পা থেকে কাঁটা তুলছে।

চারিদিকের দেওয়ালেই দেব-দেবী ও সুরসুন্দরীদের মূর্তির মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ড্রাগনমূর্তি খোদিত। কেন, কে জানে?

প্রদক্ষিণ শেষে উঠে আসি মন্দিরে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে যজ্ঞবেদি। চারিদিকে চারটি কারুকাযময় স্তম্ভ। তবে সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে সিলিং। যেমন বিন্যাস, তেমনি কারুকার্য। শুনেছি আমাদের শিল্পশাস্ত্রে একে বলা হয় সংবরণ। এটি নাকি মধ্যযুগের পশ্চিমভারতীয় মন্দিরের ঢঙে তৈরি। তবে সংবরণের এখানে-ওখানে দু-একটি করে মিথুনমূর্তি খোদিত।

গর্ভগৃহের দ্বারে এসে দাঁড়াই। দরজার ওপরে কয়েকটি মূর্তি রয়েছে। তাঁদের মাঝে রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

মন্দিরের মধ্যস্থলে চার ফুট আট ইঞ্চি বামন অবতারের অপূর্বমূর্তি। তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে তাঁর হাত ভাঙা। তাহলেও বলব—এমন সুন্দর ও প্রাণময় বামনমূর্তি আমি আর কোথাও দেখি নি।

## ॥ দশ

বাংলোয় ফিরে আসতে প্রায় বেলা দুটো হয়ে গেল। এর আগেই 'কিচেন' বন্ধ হয়ে যাবার কথা। তবু আমাদের জন্য ওরা খুলে রেখেছে আজ। অতএব

খাবার পাওয়া গেল। তবে আগে খেয়ে নিয়ে পরে স্নান করতে হল। স্নানের গরমজল যে সব সময়েই পাওয়া যায় এখানে।

বামন মন্দির দেখে খাজুরাহো গ্রাম থেকে আমাদের পায়ে হেঁটে ট্যুরিস্ট্ বাংলোয় ফিরতে হয়েছে। রিক্সা-টাঙ্গা কিছুই পাওয়া যায় নি। কষ্ট হয় নি, তবে হেঁটে আসতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ সময় লেগেছে। আর শীতকাল হলেও রোদটা বেশ চড়া।

আসার পথে আমরা খাজুরাহো গ্রামের এম. ই. স্কুলটি দেখেছি। আর দর্শন করেছি রামভক্ত শ্রীমহাবীরজীকে। খাজুরাহো গ্রাম ও বাস স্ট্যাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় পথের পাশে একটি নূতন মন্দিরে শ্রীহনুমান সযত্নে রক্ষিত রয়েছেন। সাতফুট উঁচু পাথরের মূর্তি। বলা বাহুল্য তিনি ভক্তদের তেল ও সিঁদুরে প্রলিপ্ত।

নূতন মন্দির হলেও মূর্তিটি সুপ্রাচীন। মূর্তির বেদিতে ৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপি রয়েছে। এটি খাজুরাহের প্রাচীনতম শিলালিপি।

স্নানের পরেই পথে বেরিয়ে পড়া গেল। হ্যাঁ, আমরা আবার মন্দির দেখতে চলেছি। মন্দির দেখার জন্যই তো খাজুরাহে আসা। গতকাল এখানে এসেই আমরা 'ওয়েস্টার্ন গ্রুপ' দেখে এসেছি। কিন্তু সে দেখা ঠিক দেখা নয়। গাইডের সঙ্গে না দেখলে দেখা হয় না ওয়েস্টার্ন গ্রুপ্। আর ওয়েস্টার্ন গ্রুপ্ ভাল করে না দেখলে রূপতীর্থ খাজুরাহো অদেখা থেকে যায়।

ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট্ অফিস প্রতি কাজের দিনে সকাল দশটা ও বিকেল সাড়ে তিনটায় পশ্চিম মন্দিরগোষ্ঠীতে দুটি কণ্ডাক্টেড্ ট্যুর পরিচালনা করে থাকেন। জনপ্রতি মাত্র দুটি করে টাকা দিতে হয়। আমরা এখন তাতেই যোগ দিতে চলেছি।

খাজুরাহো-মাহোবার সেই একই বাসপথ ধরে ট্যুরিস্ট্-বাংলো থেকে ট্যুরিস্ট্ অফিসে চলেছি। খাজুরাহো থেকে মাহোবা ৪৫ মাইল।

কিন্তু মাহোবা নয়, রূপতীর্থ খাজুরাহের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলেছি। বিন্ধ্যাচল পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত আট বর্গমাইল জায়গা নিয়ে খাজুরাহো। এখন এখানে তিনটি গোষ্ঠীতে প্রকৃত দর্শনীয় বিশটি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে দক্ষিণ গোষ্ঠীর দুটি ও পূর্ব গোষ্ঠীর সাতটি মন্দির আমরা আজ সকালে দেখেছি। পশ্চিম গোষ্ঠীর এগারোটি মন্দিরের প্রধান পাঁচটি মন্দিরে গতকাল বিকেলে একবার চোখ বুলিয়ে গিয়েছি। এখন আবার গাইডের সঙ্গে ভাল করে দেখতে চলেছি।

পশ্চিম গোষ্ঠীর এগারোটি মন্দিরের নাম—মাতঙ্গেশ্বর, বরাহ, লক্ষ্মণা, কাণ্ডারিয়া মহাদেব, দেবী জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বনাথ, নন্দী, পার্বতী, লালগুয়াঁ মহাদেব ও চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির। মাতঙ্গেশ্বর, লালগুয়াঁ মহাদেব ও চৌষট্টি যোগিনী মন্দির তিনটি ছাড়া বাকি আটটি মন্দির একই ঘেরার মধ্যে খুব কাছাকাছি অবস্থিত। পণ্ডিতগণের ধারণা মন্দির নির্মাণের আগে এক সুবিশাল সরোবর খনন করা হয়েছিল। তারই তীরে তীরে নির্মিত হয়েছিল এই আটটি মন্দির। শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, জল ছাড়া যে সংসারে কোন সৃষ্টি সম্ভব হয় না, এ সত্যটি সেদিনের স্থপতিদেরও অজানা ছিল না।

পরবর্তীকালে সেই সরোবর মজে গিয়েছে। আর এখন সেখানে তৈরি করা হয়েছে সবুজ ঘাস আর রঙীন ফুলের পার্ক। বড় বড় গাছে ছাওয়া প্রশস্ত পায়ে-চলা পথ। পথের পাশে বিশ্রামের আসন ও জলের কল। যেমন মনোহর পরিবেশ, তেমনি মনোরম মন্দির। আমি সেই মন্দিরমালার কথা ভাবছি।

নানা ভাবনা। এ ভাবনার শেষ নেই। রূপতীর্থ খাজুরাহের ভাবনা সীমাহীন। তবু সেই ভাবনাই পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি।

খাজুরাহের মন্দির থেকে আমরা খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকের ভারতীয় সমাজ ও ধর্মীয় জীবনকে জানতে পারি। জানতে পারি যে পৌরাণিক দেবতারাই সেকালে প্রধান আরাধ্য ছিলেন। জৈনমন্দিরে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এই ধারণার সত্যতা স্বীকার করছে।

খাজুরাহের মন্দির থেকে আমরা তৎকালীন রাজশক্তির ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ পাই। চান্দেলা রাজারা ছিলেন শৈব। তাই তাঁরা তৈরি করেছেন মাতঙ্গেশ্বর, কাণ্ডারিয়া, বিশ্বনাথ, নন্দী, লালগুয়াঁ মহাদেব ও দুলাদেও মন্দির। কিন্তু বৈষ্ণব, শাক্ত ও সূর্য উপাসকদের প্রতিও তাদের সমান সহানুভূতি ছিল। তাই তাঁরাই নির্মাণ করেছেন লক্ষ্মণা, জাওয়ারী, বামন ও চতুর্ভুজের মতো বৈষ্ণবমন্দির, জগদম্বা ও চৌষট্টি যোগিনীর মতো শাক্তমন্দির এবং চিত্রগুপ্তের মতো সূর্যমন্দির। সব চেয়ে বড় কথা জৈনমন্দির নির্মাণেও শৈব রাজা প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই সার্থক রূপটি রূপতীর্থ খাজুরাহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আমি বলছি রূপতীর্থ কিন্তু গবেষক শ্রীকানোয়ার লাল তাঁর 'Immortal

Khajuraho' বইতে বলেছে, য 'A world of beauty.' কথাটি কোনমতেই মিথ্যে নয়। খাজুরাহো সত্যই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌন্দর্যের জগৎ।

খাজুরাহের ভাস্কর্য উৎকর্ষতায় উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় শিল্পসৃষ্টিকে অতিক্রম করেছে। মনুষ্য-শরীরের বিশেষ করে নারীদেহের রমণীয়তা প্রকাশে খাজুরাহের ভাস্কর্য অতুলনীয়। নারীদেহের প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণকে খাজুরাহের শিল্পীরা জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। একটা ভাবাবেশকর পরমানন্দে অনুপ্রাণিত না হয়ে উঠলে কঠিন পাথরে কোমল নারীদেহের এমন বাস্তব রূপদান সম্ভব নয়। তাঁরা নারীদেহের সকল সৌন্দর্য ও রহস্যকে সব চেয়ে আকর্ষণীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরগাত্রে মূর্ত করে তুলেছেন। হাজার বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে সেকালের সুন্দরী ও নর্তকীরা তাঁদের রক্তমাংসের শরীর ও মনের সমস্ত কামনা-বাসনা নিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। তাই খাজুরাহো মন্দিরের দেওয়ালগুলি প্রকৃতপক্ষে আর্ট গ্যালারী, এক অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য-জগৎ।

প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক কৃষ্ণ দেব এ সম্পর্কে বলেছেন—'The walls of the Khajuraho temples represent female types of ravishing beauty vaunting their voluptuous charms in an infinite variety of lovely attitudes and postures. In fact, this art excels all other contemporary schools of art in the vivid portrayal of human moods and fancies which are often expressed through the medium of gestures and flexious with a subtle but purposive sensuous provocation…'

ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। সেই সৌন্দর্যের জগৎকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন। দেখা যাচ্ছে বিশ্বনাথ ও লক্ষ্মণা মন্দির। দেখছি আর ভাবছি।

খাজুরাহের সব মন্দির পাথরে তৈরি। কিন্তু কোন পাথুরে পাহাড় নেই এখানে। পান্না থেকে পাথর বয়ে আনতে হয়েছে। প্রথমদিকে গ্র্যানিট্ শিলা ব্যবহার করা হত। আর তাই প্রাচীনতম মন্দির চৌষট্টি যোগিনী শুধুই গ্র্যানিট্ দিয়ে নির্মিত। তারপরে গ্র্যানিট্ ও বেলেপাথর দুই-ই ব্যবহার করা হয়েছে। লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দিরটি এই দুই ধরনের পাথর মিলিয়ে তৈরি।

এর পরে খাজুরাহের শিল্পকলায় পরিবর্তন এসেছে। ভাস্কর্য স্থাপত্যের ওপরে

আধিপত্য বিস্তার করেছে। মূর্তিময় মন্দির নির্মাণের যুগ উপস্থিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বেলেপাথরের ব্যবহার বেড়েছে। গ্র্যানিট্ পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ গ্র্যানিট্ অত্যন্ত শক্ত, ভাল মূর্তি তৈরির পক্ষে অনুপযুক্ত।

তবে খাজুরাহের শিল্পীরা অত্যন্ত উচ্চমানের ( Fine grain ) বেলেপাথর ব্যবহার করেছেন। তাঁরা পীতাভ ( buff ), পাটল ( pink ) এবং হলুদ রঙের পাথরে বেশি কাজ করেছেন। বেলেপাথর নরম বলে লোহার খিল ( Clamp ) দিয়ে দুখানি পাথরকে জোড়া দিয়েছেন।

স্থাপত্যশিল্পের বিচারে খাজুরাহো মন্দিরগোষ্ঠীর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমসাময়িক কালে নির্মিত অন্যান্য স্থানের মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। যেমন এখানকার প্রতিটি মন্দির পাথরের উঁচু ভিত বা বেদির ওপরে নির্মিত। স্থাপত্যের ভাষায় এই ভিতকে বলে জগতী। অন্যান্য জায়গার মতো এখানকার মন্দিরে চারিপাশে কোন রক্ষাপ্রাচীর নেই। খাজুরাহের প্রায় প্রত্যেকটি মন্দির অন্তত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত—গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ এবং তোরণ। বড় মন্দির কয়টিতে অর্থাৎ কাণ্ডারিয়া, লক্ষ্মণা ও বিশ্বনাথ মন্দিরে আরও দুটি অংশ রয়েছে—মহামণ্ডপ এবং প্রদক্ষিণ-পীঠ। এই তিনটি মন্দিরে মহামণ্ডপ সর্ববৃহৎ অংশ। আর প্রদক্ষিণ-পীঠ গর্ভগৃহের তিনদিকে পরিক্রমার সংকীর্ণ পথ।

প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক স্টেলা ক্র্যাম্‌রিশ ( Stella Kramrisch ) খাজুরাহের মন্দিরগোষ্ঠী সম্পর্কে লিখেছেন—'Each of these buildings was house and body of God, of Siva, of Vishnu, or Surya, close to each other and similar in plan, elevation and images ;···These images are flanked, tier upon tier, by those of the celestial host without particular reference to the specific images.*

তাঁর মতে খাজুরাহো মন্দিরের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই মূর্তিসজ্জা এবং মূর্তিমালা মন্দিরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা খাজুরাহের শিল্পীরা শুধু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। তাঁরা ভক্তির ভণিতা করে জীবনকে

* 'Homage to Khajuraho'.

অস্বীকার করতে পারেন নি, ধর্মের আবরণ দিয়ে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে চাপা দেন নি। তাই তারা দেব দেবীদের মূর্তির পাশে সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণ করেছেন, তৈরি করেছেন মিথুনমূর্তি।

জীবনের রূপ ও রসে সমৃদ্ধ সেই-সব মন্দির আমরা আবার দর্শন করব। এবারে গাইডের সঙ্গে দেখব। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। বাঁদিকে ট্যুরিস্ট অফিস। আমরা ভেতরে ঢুকি।

## ॥ এগারো ॥

সব মিলিয়ে আমরা সাড়ে আটজন। হাফ টিকিটের ব্যবস্থা নেই, সুতরাং সরকার সর্বসাকুল্যে আঠারোটি টাকা মাত্র পেলেন আজ বিকেলের এই 'কণ্ডাক্‌টেড ট্যুর' থেকে। হাফ টিকিটের ব্যবস্থা নেই কারণ কর্তৃপক্ষ চান না কোন অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকা খাজুরাহের মন্দির দর্শন করে। অথচ দরজায় 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো সম্ভব নয়। কারণ এগুলো মন্দির। সুতরাং এটা দর্শনার্থীদের নিজস্ব ভাবনার বিষয়। কিন্তু দুঃখের কথা খাজুরাহে রওনা হবার আগে অধিকাংশ পিতা-মাতা এ ভাবনাটাকে আমল দেন না। ফলে তাঁরা যেমন খোলা মন নিয়ে দর্শন করতে পারেন না, তেমনি তাঁদের কিশোর-কিশোরী সঙ্গীরাও মাঝে মাঝেই লজ্জায় মরে যায়। তারা তাদের কৌতূহল ও পুলক প্রকাশ করার পথ পায় না। ফলে তারাও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

আমরা চারজন, এক দক্ষিণ-ভারতীয় দম্পতি ও তাঁদের বছর বারো বয়সের কিশোরী কন্যা, এবং মধ্যপ্রদেশের একজোড়া তরুণ-তরুণীকে নিয়ে আমাদের দল। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে এরা ছতরপুরে থাকে, দুজনেই কলেজে পড়ে। 'কলেজ এক্‌স্‌ক্যারশন্‌'-এর নাম করে মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ওরা অভিসারে এসেছে।

তা আসুক গে। যে-কোন শৈলবাস ও সৈকতাবাসে এমন ঘটনা হামেশা ঘটছে। আর খাজুরাহো অবশ্যই অভিসারের উপযুক্ত স্থান। অতএব সমাজপতি সেজে এদের উপদেশ দেওয়া অর্থহীন। আপাতত এরা আমাদের সঙ্গী। আমরা গাইডের সঙ্গে 'ওয়েস্টার্ন গ্রুপ' দেখতে এসেছি।

আমাদের গাইড মিঃ প্যাটেল বেশ কয়েক বছর ধরে এ কাজ করছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁর চেহারাটি সুন্দর, ভদ্রলোক বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন এবং মনে হচ্ছে বেশ পড়াশুনা করেন।

সরকার কেবল এই মন্দির-শ্রেণীর চারিপাশেই দেওয়াল ও তারকাটার বেড়া দিয়ে টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা টিকিট কেটে ভেতরে আসি।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ফটো ও বইয়ের দোকান। একটি লোক একটা বাক্স নিয়ে বসেছে। ছবি এবং বই বিক্রি করছে। ছবি মানে মন্দির ও মূর্তির ফটো আর বই বলতে খাজুরাহের মন্দির ও মিউজিয়ামের ওপরে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের দুখানি সচিত্র পুস্তক।

সঙ্গীদের কেনা-কাটার পরে সুরকির পথ দিয়ে এগিয়ে চলি। পথের পাশে সবুজ 'লন্' : আগেই বলেছি সেকালে এখানে এক মস্ত বড় সরোবর ছিল। সেটি নিশ্চয়ই মজে গিয়েছিল। তাই সেটিকে সম্পূর্ণ ভরাট করে তৃণাচ্ছাদিত চমৎকার মাঠে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেই সবুজের ওপর দিয়েই বিভিন্ন মন্দিরে যাতায়াত করার লাল পথ আর পথের ধারে ও মাঠের মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ আর মহুয়া গাছ। কোথাও কোথাও ফুলবাগান। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। চমৎকার পরিবেশ।

গেট থেকে খানিকটা পশ্চিমে এগিয়ে বাঁদিকের পথ ধরি। এটি সংকীর্ণতর পায়ে-চলা পথ।

পথের বাঁদিকে দুটি ছোট ও ডানদিকে একটি বড় মন্দির। বড় মন্দিরটি লক্ষ্মণ মন্দির—খাজুরাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আর ছোট মন্দির দুটির নাম—দেবী ও বরাহ।

বরাহ মন্দিরের সামনে আসতেই গাইড বলেন, "এবারে জুতো খুলতে হবে।"

"এখানে কি পুজো হয়?" আমাদের কিশোর সঙ্গিনী সহসা প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "না।"

"তাহলে জুতো খুলতে হবে কেন?"

"পুজো না হলেও মন্দির তো বটেই। দেখছ না ওপরে বরাহ ভগবানের মূর্তি রয়েছে। চমৎকার মূর্তি। তাড়াতাড়ি চলো।"

সে আর কোন আপত্তি করে না। জুতো খুলে উঠে আসি সিঁড়ি বেয়ে—দশ ধাঁপ সিঁড়ি।

ছোট মন্দির—চৌকো (আয়তক্ষেত্র) ও চৌচালা। পিরামিডাকৃতি পাথরের চাল চোদ্দটি কারুকার্যহীন মসৃণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চারিদিকে কোন দেওয়াল নেই।

সবাই উঠে আসার পরে গাইড জানান, "এই বরাহ মন্দিরটি মাত্র সাড়ে বিশ ফুট লম্বা ও ষোল ফুট চওড়া।

মন্দির নয়, আমরা দেখছি বরাহ মূর্তিটি। সবাই তা-ই দেখেন। আমরাও দণ্ডায়মান বরাহ-অবতারকে প্রণাম করি।

গাইড বলেন, "পৌনে ন'ফুট লম্বা ও পৌনে ছ'ফুট উঁচু এই বরাহমূর্তিটি মাত্র একখানি পাথর থেকে তৈরি। প্রায় হাজার বছর আগে তৈরি, কেউ কোনদিন ঘষা-মাজা করে নি। অথচ কি রকম চক্‌চক্ করছে! আর এর সারা গায়ে দেখুন, হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি খোদিত।"

"কতগুলো মূর্তি আছে?" বরাহের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কিশোরী প্রশ্ন করে।

গায়ে হাত বোলাচ্ছি আমরা সকলেই।

গাইড মৃদু হাসেন। বলেন, "আমি গুনি নি। ঠিক ঠিক গোনা খুবই কষ্টকর। ভুল হয়ে যায়। তাই গবেষকরাও বড় একটা সে-চেষ্টা করেন নি। কেবল একজন গুনেছেন।"

"তিনি কে?" রণজিৎ জিজ্ঞেস করে।

গাইড উত্তর দেন, "তার নাম স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম।"

সেই একটি নাম। ভারতবর্ষের যেখানেই কোন প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শন, সেখানেই বার বার ঘুরে-ফিরে এই একটি নাম—কানিংহ্যাম আর কানিংহ্যাম…।

"তা তিনি কতগুলো মূর্তির কথা বলেছেন?" কিশোরী আবার জিজ্ঞেস করে।

গাইড বলেন, "ছ'শ' চুয়াত্তরটি।"

"আচ্ছা, বরাহ অবতারের নিচে মেঝেতে এই সাপের মূর্তিটি কেন?" গৌতম প্রশ্ন করে।

গাইড উত্তর দেন, "ইনি বরাহ অবতারের পরমভক্ত শেষনাগ।" একটু

থেমে গাইড আবার বলেন, "এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। তাই পণ্ডিতদের ধারণা এটি ৯০০ থেকে ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত।"

না, আমাদের কিশোরী সঙ্গিনীর লক্ষ্য আছে বলতে হবে। বরাহমূর্তির মুখের ঠিক সামনে, মন্দিরের মেঝেতে একটা দাগ দেখিয়ে সে গাইডকে বলে, "এখানে কার মূর্তি ছিল?"

"বসুন্ধরা মানে পৃথিবীর।" গাইড বলেন, "তুমি নিশ্চয়ই জানো, ভগবান বরাহরূপে রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে নিজের বাঁদিকের দাঁত দিয়ে তাঁকে ধারণ করেছিলেন। সেই ভাবেই পৃথিবীর মূর্তিটি বসানো ছিল এখানে। পরে কোন সময়ে কোন ভাবে সেটি ভেঙে গিয়েছে।"

গাইড থামলেন। কিন্তু মিশনারী স্কুলের ছাত্রী আমার কিশোরী সঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

আর কেবল কিশোরীর কথাই বা বলি কেন, তার মা-বাবা এবং ছত্তরপুরের তরুণ-তরুণীও কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই কিশোরীকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি বরাহ অবতারের কাহিনী জানো?"

"না তো!" সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

তার বাবা যোগ করেন, "কেমন করে জানবে? আমার মেয়ে যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে।"

ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াশুনা করলেই পুরাণ-কাহিনী জানতে পারে না, এর কোন যুক্তি নেই। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও শিল্প সমালোচক ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী তো ইংরেজ মাতার গর্ভে বিলেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন। অথচ ভারতের বাইরে তিনি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক।*

কিন্তু এই কোট-প্যান্ট্-টাই পরা ভারতীয় সাহেবকে সেকথা বলা অর্থহীন, তার চেয়ে বরং তাঁর কিশোরী কন্যার কাছে সংক্ষেপে বরাহ অবতারের কথা বলা ভাল। কারণ মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মা-বাবাও কাহিনীটি জানতে পারবেন।

অতএব আরম্ভ করি—"বরাহ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। বিভিন্ন পুরাণে এই অবতারের কথা বলা হয়েছে। সব পুরাণের সব কথা বলার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবতের কাহিনীটি তোমাকে বলছি।"

* 'History of Indian and Indonesian Art.'

কিশোরী মাথা নেড়ে বলে, "বেশ বলুন।" সে এগিয়ে আসে আমার পাশে।

বলতে থাকি, "ভাগবতের মতে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের অত্যাচারে পৃথিবী প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্না হলেন। পৃথিবীর প্রাণীরা সবাই হল নিরাশ্রয়। স্বায়ম্ভুব মনু তখন ব্রহ্মার কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

"বিপদে পড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাগত হলেন। তিনি ভগবানের স্তব করতে থাকলেন।

"সহসা ব্রহ্মার নাক দিয়ে আঙুলের সমান এক বরাহপোত বেরিয়ে এলেন। বাইরে বেরিয়েই বরাহপোত বড় হতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আকাশ সমান বড় হয়ে উঠলেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল।

"ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা বুঝতে পারলেন, এই বরাহ আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবানের অবতার। দেবতারা তখন একযোগে তাঁর স্তব শুরু করে দিলেন।

"দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য প্রলয়-পয়োধিজলে প্রবেশ করলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তিনি রসাতলে পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি সর্বজীবের আশ্রয় পৃথিবীকে নিজের পেটের ভেতরে নিয়ে তাকে বাঁদিকের দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখলেন। পাছে পৃথিবী তাঁর পেটের ভেতরে হারিয়ে যায়!

"তারপরে ভগবান রসাতল থেকে উঠে এলেন। তিনি পৃথিবীকে পেটের ভেতর থেকে বের করে বাইরে এনে রাখলেন। সেই দৃশ্যটাই বোধ করি সেকালের শিল্পীরা এই মন্দিরে মূর্ত করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, পৃথিবীর মূর্তিটি ভেঙে গিয়েছে।"

"তারপরে কি হল, বলুন না।" আমি থামতেই অসহিষ্ণু স্বরে কিশোরী বলে ওঠে। কনভেন্টে পড়া মেয়ের তাহলে ভাগবত খারাপ লাগে নি!

তাই আবার বলি, "তারপরে দেব-দেবীরা বরাহরূপী ভগবানের স্তবগানে ত্রিভুবন মুখরিত করে তুললেন। সেই বরাহ ভগবানের পবিত্র মন্দির দর্শন করে আমরাও ধন্য হলাম।"

কিন্তু আমার উপসংহারে কিশোরীর মন ভরে না। সে আবার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, সেই হিরণ্যাক্ষের কি হল?"

"ভগবান তাঁকে বধ করেছিলেন।...কিন্তু আর দেরি নয়, গাইড চলে যাচ্ছেন। তিনি চটে যাবেন।"

আমরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি বরাহমন্দির থেকে। মহাকবি জয়দেবের সেই অমর শ্লোক মনে পড়ছে আমার—

'বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃত-শূকর-রূপ
জয় জগদীশ হরে॥'

বরাহ মন্দিরের ঠিক সামনেই লক্ষ্মণা মন্দির। কথাটা বোধ করি ঠিক বলা হল না। বলা উচিত লক্ষণা মন্দিরের চত্বরে বরাহ মন্দির। কারণ লক্ষ্মণা মন্দির খাজুরাহের বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির ছুটির অন্যতম। ৯৮ ফুট দীর্ঘ ও ৪৫ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত এই মন্দিরটি ভারতের উন্নত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আরেকটা কথা, লক্ষ্মণা মন্দিরের লক্ষ্মণ কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ছোট ভাই নন। মহারাজ ঢঙ্গের পিতা যশোবর্মনের আরেক নাম লক্ষ্মণ বর্মন। তিনি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই চতুর্ভুজ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এটি খাজুরাহের একটি প্রাচীনতম মন্দির অথচ প্রায় অক্ষত। সেকালে খাজুরাহে প্রায় প্রত্যেক বড় মন্দিরের চারকোণে চারটি ছোট ছোট মন্দির তৈরি করা হত। একমাত্র এই মন্দিরেই সেই মন্দির চারটি অক্ষত রয়েছে।

গাইড জুতো খুলতে নিষেধ করেন। বলেন, "আগে মন্দিরের চারদিক একবার ঘুরে জগতীর (Platform) মূর্তি ও কারুকার্য (Mouldings & Friezes) দেখে নিই।"

পূর্বমুখী মন্দির। আমরা গাইডের সঙ্গে বাঁদিক দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করি। এটি মন্দিরের দক্ষিণগাত্র, পাশেই মাতঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কিন্তু দুয়ের মাঝে উঁচু দেওয়াল। মাতঙ্গেশ্বর খাজুরাহের একমাত্র জীবিত মন্দির। দৈনিক সেবা-পূজা হয়, সুতরাং সর্বসাধারণের অবারিত দ্বার। তাই মন্দিরটিকে এই চৌহদ্দির বাইরে রাখা হয়েছে।

কিন্তু মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের কথা এখন থাক, তার চেয়ে লক্ষণা মন্দির দেখা

যাক। জগতীর দেওয়ালে সর্বত্র দু'সারি মূর্তিমালা—ছোট ছোট মূর্তি। গাইড বলেন, "এগুলি গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণ।"

আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। মন্দিরনির্মাণের পদ্ধতি, শিকারযাত্রা, শোভাযাত্রা, তৎকালীন সংসারযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রার মূর্তিমালা রয়েছে। অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদল সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে চলেছেন। সেনাপতিদের বড় বড় দাঁড়ি ও বিরাট-বিরাট ভুঁড়ি। তাঁরা বারবণিতাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন।

আর রয়েছে কিছু মিথুনমূর্তি—বিচিত্র সঙ্গমলীলা। গাইডের ভাষায়—'Reversed Union', 'Animal-like Congress', 'Man cohabiting with a Mare.'

গাইড কিন্তু থামছেন না কোথাও। আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন আর হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন। একটি মূর্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, "ইনি হলেন সূর্যপুত্র রেবন্ত।"

কয়েক পা এগিয়ে গাইড আবার বলেন, "শিকারীরাও দেখুন সৈন্যদের মতই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। আর দেখুন, কত রকমের অস্ত্রের ব্যবহার ছিল সেকালে।"

"কোথায়, দেখি!" কিশোরী এগিয়ে যায় গাইডের পাশে।

গাইড আঙুল দিয়ে দেখান আর বলেন, "এই দেখো, তীর-ধনুক, তরোয়াল, খড়্গ, ছোরা, বর্শা, বল্লম, ঢাল আরও কতো…।"

কেবল সময় সংক্ষেপ করার জন্যই যে গাইড কোথাও থামছেন না তা নয়। বাস্তবিকপক্ষে এগুলি মোটেই উল্লেখযোগ্য মূর্তি নয়। তাছাড়া হাতের নাগালের মধ্যে বলে অধিকাংশই ভগ্নমূর্তি।

মন্দিরের চারিদিকে ঘুরে আমরা আবার আসি সিঁড়ির সামনে। গাইড বলেন, "এবারে জুতো খুলতে হবে।"

"কিন্তু এ মন্দিরে যখন পুজো হয় না, জুতো প'রে ওপরে যেতে দোষ কি?" কিশোরী জিজ্ঞেস করে।

গাইড কিছু বলতে পারার আগেই তার বাবা বলেন, "দোষ হয়তো কিছু নেই, কিন্তু দেখছ না জুতো খোলার নোটিশ রয়েছে সামনে।"

"নোটিশটা অর্থহীন।"

"না, ঠিক অর্থহীন নয়।" আমি কিশোরীকে বলি, "এখন পুজো না হলেও এটি প্রাচীন মন্দির, পবিত্র স্থান। আর সকলেরই সে পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত।"

কিশোরী আর কোন প্রতিবাদ করে না। এগারো ধাঁপ সিড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দির-চত্বরে অর্থাৎ জগতীর ওপরে। আরও পনেরো ধাঁপ সিড়ি বেয়ে অধিষ্ঠান (Plinth) পেরিয়ে উঠতে হবে মন্দিরতোরণে। কিন্তু তার দেরি আছে কিছু। আমরা আগে মন্দিরগাত্রের মূর্তিমালা দেখব, তারপরে মন্দিরে যাবো।

শুনেছি এই মন্দিরগাত্রে মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাস্কর্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যেমন মা ও সন্তান ('woman with child'), পত্র-লেখিকা ('woman writing letter') এবং মুকুরে মুখ দেখা মেয়ে ('woman looking into mirror')। মূর্তিগুলো অবশ্য এখন আর এখানে নেই, রয়েছে কলকাতার যাদুঘরে। তবে আরও অনেক ভাল ভাল ভাস্কর্য রয়েছে এই মন্দিরের জঙ্ঘা বা বাইরের দেওয়ালে।

তাছাড়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে এই মন্দিরের কতগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই মন্দির নির্মাণের সময়েই খাজুরাহে প্রথম বেলেপাথরের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এর গর্ভগৃহটি পঞ্চরথের মতো। খাজুরাহের অন্য কোন বড় মন্দিরের গর্ভগৃহ এমন নয়। মূল শিখরের চারিপাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট শিখর রয়েছে। এটিও খাজুরাহের মন্দিরশিল্পে প্রথম। তবে শিখরের শিল্পকলা সাধারণ মধ্যযুগীয়।

গাইডের সঙ্গে এগিয়ে চলি। আমরা ডানদিক দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করছি। বাঁদিকে প্রখর রোদ বলেই গাইড এদিকটা বেছে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য এটি মন্দিরের উত্তরদিক।

মন্দিরগাত্রে দু'সারি মূর্তিমালা। কোথাও কোথাও অবশ্য তাদের ওপর অথবা নিচে নানা মূর্তি রয়েছে। সবই প্রাণময় মূর্তি। এমন নিঁখুত এবং জীবন্ত মূর্তি এর আগে খুব বেশি দেখি নি। মনে হচ্ছে দেব-দেবী, মানব-মানবী এবং সুরসুন্দরীরা অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গিতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন।

প্রায় প্রতিটি মূর্তি দর্শনীয়। নৃত্যরতা দেবদাসী, নাগিনীকন্যা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, হর-পার্বতী ও গণেশ। কোন সুন্দরী বল নিয়ে খেলছে, কেউ স্নান করছে কেউ বা পিঠ ঘষছে। যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্য আর ভঙ্গিমা। নারীর দেহ ও মনের সকল রূপ ও রস মূর্ত হয়ে উঠেছে কঠিন পাথরের বুকে।

জনৈকা প্রসাধনরতা সুরসুন্দরীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। তার

পরনে শাড়ী ও কাচুলি। পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে মাথাটি একটু উঁচু করে সে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার ডান হাতে প্রসাধনসামগ্রী, পাশে পরিচারিকা। সে সুরসুন্দরীকে প্রসাধনে সাহায্য করছে। তার মূর্তিটি ছোট। খাজুরাহের মন্দিরগাত্রে ছোট মূর্তি দিয়ে সেবক-সেবিকাদের বোঝানো হয়েছে।

বলা বাহুল্য এ মন্দিরেও কিছু মিথুনমূর্তি রয়েছে। আর অন্যান্য মন্দিরের মতো সেগুলোর বেশির ভাগ রয়েছে গর্ভমন্দিরের গায়ে। তারই একজোড়া মূর্তির সামনে এসে গাইড স্থির হলেন। আলিঙ্গনরত একজোড়া নারী-পুরুষ ও একটি বানর। গাইড বলেন—'A woman frightened of a monkey clings to her lover, while he tries to drive the animal away with a crook. This is one of the most tender scenes depicted in Khajuraho, showing an aspect of the ordinary life of the time from a romantic angle which elevates the incidental and the purely human into the poetry of stone.'

কিশোরী কনভেন্টে পড়ে, সুতরাং সে সবই বুঝতে পারছে। কি ভাবছে কে জানে? তবে বলছে না কিছুই, নীরবে সব দেখে যাচ্ছে।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার, ওর মা-বাবার ভাব-ভঙ্গি ও কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনেই হচ্ছে না, তাঁদের মেয়ে সঙ্গে রয়েছে।

আর তাঁদেরই কথাই বা কি বলি?' এক বাঙালী দম্পতি তো সমানে মিথুনমূর্তির ছবি তুলে যাচ্ছেন, অথচ তাঁদের সঙ্গে বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে। তার সামনেই মা-বাবা যথেচ্ছ হাসাহাসি করছেন। তাঁরাও কি ভুলে গিয়েছেন ছেলেটির উপস্থিতি?

গাইড একজোড়া সঙ্গমরত মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাদের পাশে দণ্ডধারী একজন পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন—উনি হচ্ছেন পুরোহিত। বিবাহের পরে পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে স্বামী-স্ত্রী কামক্রীড়া শিক্ষা করছে। গাইডের ভাষায়, 'Obviously a ritualistic ceremony in which the conjugating couple are lay figures in the embrace recommended by the priest with the symbolic staff on his shoulder. The lady on the side, also uninitiated bashfully hides her nudity.'

একবার থামেন গাইড। তারপরে একজোড়া চুম্বনরত মূর্তি দেখিয়ে আবার

বলেন—'The Kiss : One of the many, aspects of the devine is the physical union between the male and the female, because just as desire arose in the One and He became many, so desire arises in the many to become One :'

না, আমাদের গাইডের সত্যি বেশ পড়াশুনা আছে বলতে হবে। এগুলো তাঁর নিজের কথা নয়, শিল্প-সমালোচকদের মন্তব্য মুখস্থ করে ফেলেছেন।

আমরা দেখতে দেখতে মন্দির পরিক্রমা করছি। মন্দিরের এই পেছন দিকে অর্থাৎ পশ্চিমগাত্রে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কয়েকটি সুরসুন্দরীর মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুরসুন্দরীদের যেমন দেহের গড়ন, তেমনি ভঙ্গিমা। মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত আর দেহের প্রত্যেকটি পেশীর সঙ্কোচণ সুস্পষ্ট। তাদের পোষাক অলঙ্কার ও কেশবিন্যাস আমার সঙ্গিনীদের ঈর্ষাকাতর করে তুলেছে।

এদিকে এত রোদ, তবু এখানটায় বেশ ভিড়। কারণ এখানে কয়েকটি মিথুনমূর্তি রয়েছে। আমাদের যুবক-যুবতীও জমে যায় তাদের সঙ্গে। অতএব গাইডকে দাঁড়াতে হয় একবার।

দু-জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্তি সত্যি দেখার মতো। অপূর্ব তাদের পোষাকের বাহার ও দেহের ভঙ্গিমা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে একটি চুম্বন ও অপরটি সঙ্গমের মূর্তি। কিন্তু কোনটিই তা নয়, তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ এই পর্যন্ত। অপরূপ ভাস্কর্য।

গাইড এগিয়ে চলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণ-তরুণী আমাদের অনুসরণ করে।

সহসা কিশোরী কথা বলে। বেচারী অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। সে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, এটা কি খাজুরাহের সব চেয়ে ভাল মন্দির ?"

গাইড উত্তর দেন, "ভাস্কর্যের বিচারে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, তবে স্থাপত্যশিল্পে কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের স্থান সবার ওপরে।"

"আমরা কি এর পরে কাণ্ডারিয়া দেখব ?"

গাইড মাথা নাড়েন। কিশোরী খুশি হয়।

মন্দিরের সামনে অর্থাৎ পূর্বদিকে ফিরে আসি। এদিকেও চেয়ে দেখার মতো কয়েকটি মূর্তি রয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি তিনটি অন্যতম।

আমরা তাঁদের দর্শন করি। তারপরে পনেরো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরতোরণে।

মকর-তোরণ। অনাড়ম্বর কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দর। সিলিঙে অপরূপ খোদাই-কাজ—লতাপাতা, ফুল ও আলপনা খোদিত।

গাইড বলেন, "মন্দিরের ভেতরে সাতটি অংশ—তোরণ, অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল, গর্ভগৃহ ও প্রদক্ষিণ-পীঠ। কিন্তু ছাদটি চার ভাগে বিভক্ত। মানে এর চারটি পৃথক শিখর—তোরণের একটি শিখর, অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ এবং মহামণ্ডপের দুটি আর অন্তরাল গর্ভমন্দির ও প্রদক্ষিণ-পীঠ একটি। শেষ তিনটি অংশের ওপরে মূল-শিখর। কিন্তু আগের তিনটি শিখরের গড়ন মূল শিখর থেকে আলাদা। এ তিনটি চৌকোণা এবং অনেকটা পিরামিডের মতো।"

কেবল সিলিং নয়, মন্দিরের স্তম্ভ এবং দেওয়ালেও অপূর্ব খোদাই কাজ। স্তম্ভ এবং ছাদের সংযোগস্থলে পরীদের চমৎকার উড়ন্ত মূর্তি তৈরি করে বন্ধনীর কাজ করা হয়েছে। গাইড বলেন, "এগুলি মধ্যযুগীয় শিল্পকলার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান।"

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ ছাড়িয়ে মহামণ্ডপে এসে দাঁড়াই। গর্ভগৃহের সামনে ঠিক কেন্দ্রস্থলে যজ্ঞবেদি—অনেকটা উঁচু করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি প্রস্তরমঞ্চ।

এখানে কি কেবলই যজ্ঞ হত, রাজসভা বসত না? এ কি শুধুই দেবালয় ছিল, সেই সঙ্গে রাজগৃহ নয়? তাহলে খাজুরাহে কোন রাজপ্রাসাদ নেই কেন? প্রাসাদ ভেঙে গেল আর মন্দির অক্ষত রয়ে গেল, এ কেমন করে সম্ভব? না, সেকালের রাজারা মন্দির গড়ে সেখানেই বাস করতেন? একই বাড়িতে দেবার্চনা ও রাজকার্য পরিচালিত হত? মন্দির ও প্রাসাদ ছিল অভিন্ন? কারণ রাজা ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি।

অবশেষে গর্ভমন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়াই। দরজার গায়ে বিভিন্ন অবতার সহ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাহু, ব্রহ্মা এবং নবগ্রহের মূর্তি খোদিত। ভেতরে বিষ্ণুর দণ্ডায়মান বিগ্রহ।

"বিগ্রহটি ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা।" একবার থামেন গাইড। তারপরে আবার বলেন, "একটু আগে মণ্ডপে আপনারা মহারাজা চন্ধের যে শিলালিপি (৯৫৪ খ্রীঃ) দেখে এলেন, তা থেকে মনে হয় ৯৩০ থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে মহারাজা যশোবর্মন এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। আর মহারাজ দেবপাল তাঁকে এই বৈকুণ্ঠমূর্তি দান করেছিলেন।"

ভেতরে প্রবেশ করি। গর্ভমন্দিরে দেওয়ালেও দেখছি দু-সারি মূর্তিমালা। ওপরের সারিতে রয়েছে বিভিন্ন কৃষ্ণলীলায় মূর্তি, যেমন পুতনাবধ, কালীয় দমন, শকটভঞ্জন, কৃষ্ণ ও কুব্জা এবং বৎসাসুর তৃণাবর্ত কুবলয়াপীড়চানূর ও মুষ্টিক-বধ প্রভৃতি।

একটু অবাক হতে হয়। কারণ এইসব কৃষ্ণলীলা মূলতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অবদান। ভাগবত সঙ্কলিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতে, খ্রীষ্টীয় নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে। খাজুরাহো বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারত থেকে বহুদূরে এবং এই মন্দির নির্মিত হয়েছে দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এখানে কৃষ্ণলীলার এই সব দৃশ্য প্রমাণ করছে যে শ্রীমদ্‌ভাগবত অবশ্যই ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সঙ্কলিত এবং তখুনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা মধ্যভারতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

দু'টি গায়ক-গায়িকা এবং একটি অপরূপা অপ্সরার মূর্তি রয়েছে মন্দিরে। তারপরে ভূ-বরাহ, নরসিংহ ও হয়গ্রীবের মূর্তি দর্শন করে আমরা বিগ্রহের সামনে সমবেত হই। বিচিত্র বিগ্রহ—ত্রিমুখী চতুর্ভুজ মূর্তি। মাঝখানে বিষ্ণু এবং দু-পাশে বরাহ ও সিংহের মুখ। শান্ত সুন্দর ও জীবন্ত বিগ্রহ।

তোরণ থেকে গর্ভমন্দির বহুদূরে। কেবল ব্যাল্‌কনীগুলো দিয়ে কিছু আলো আসছে মণ্ডপ ও মহামণ্ডপে। গর্ভমন্দিরের তিনদিকে দেওয়াল, মাত্র একদিকে একটি দরজা। স্বভাবতঃই ভেতরটা অন্ধকার। তাই আমাদের টর্চ জেলে দেওয়ালের ভাস্কর্য দেখতে হয়েছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ মূর্তিটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কেমন করে, কোথা থেকে আলো আসছে বলতে পারব না, তবে তাঁর সারাগায়ে আলোর আভা। মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময় মূর্তি। কি বিস্ময়কর স্থাপত্যচাতুর্য!

প্রণাম করি। কেবল মানুষের ভগবানকে নয়, সেই সঙ্গে সেই নাম-না-জানা হারিয়ে যাওয়া স্থপতি ও ভাস্করদের। এ-মন্দির তাঁদের সফল সৃষ্টি আর তাঁরাও সার্থক সৃষ্টি মানুষের ভগবানের।

মূর্তিময় প্রদক্ষিণ পথ দিয়ে গর্ভমন্দির পরিক্রমা করে বেরিয়ে আসি বাইরে। নেমে আসি নিচে। সুরকির পথ ধরে এগিয়ে চলি পশ্চিমে অর্থাৎ লক্ষ্মণা মন্দিরের পেছনদিকে। এটি লক্ষ্মণার উত্তর দিক। এই পথ দিয়েই আমরা তখন জগতী প্রদক্ষিণ করেছি। আমাদের ডানদিকে সবুজ মাঠ, মাঠের

শেষে বিশ্বনাথ। কিন্তু সে মন্দির পরে দর্শন করব। এখন চলেছি কাণ্ডারিয়া-মহাদেব মন্দিরে।

লক্ষ্মণা শেষ হয়ে গেল। এবারে পথের দু-পাশেই সবুজ ময়দান। মাঝে মাঝে দু-একটি গাছ। ময়দানের বুক চিড়ে আরও দুটি সুরকির পথ—সবুজের মাঝে মাঝে লাল আল্পনা। আর আমাদের সামনে প্রায় এক সারিতে তিনটি অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে।

এই পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে কাণ্ডারিয়া-মহাদেব মন্দিরের সামনে। সেখান থেকে আরেকটি পথ প্রসারিত হয়েছে উত্তরে—জগদম্বা ও চিত্রগুপ্ত মন্দিরের পাদদেশে।

কিন্তু আমার চোখ দুটি নিবদ্ধ হয়ে আছে কাণ্ডারিয়ার দিকে। তার দিকে একবার তাকালে যে চোখ ফেরানো যায় না। সে যেমন বিশাল, তেমনি সুন্দর—স্বর্গীয় সৌন্দর্য তার সারাগায়ে। সে তো স্বর্গেরই প্রতীক।

মনে পড়ছে শিল্প-সমালোচকদের সেই মন্তব্য—'...the temple is the symbol of Mount Kailas or Mount Meru, the abode of Gods, the vision of the worshipper ascends above the sculptured bands to the peak or Sikhara, suggesting the flight to the vertical heights of the Himalayas.'* দেবতাত্মা হিমালয় তথা কৈলাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই মন্দির।

তাড়াতাড়ি পা চালাই, কেবল আমি নয়, আমরা সবাই। সবার মনেরই বোধ করি এক অবস্থা—আর তর সইছে না।

পথটুকু ফুরিয়ে গেল। আমরা কাণ্ডারিয়ার পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙতে হবে। কিশোরী গুনতে শুরু করে, "ওয়ান, টু থ্রি......টু-এল্‌ভ, থা (র)টিন।"

গাইড বলেন, "হ্যাঁ। তেরো ধাপে তেরো ফুট উঁচু জগতী, ওখান থেকে ষোল ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আরও সাড়ে পনেরো ফুট উঠতে হবে। তারপরে পৌঁছবে মন্দিরতোরণে।"

কিন্তু তিনি আমাদের জুতো খোলার নির্দেশ দেন না। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, "খাজুরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন এই কাণ্ডারিয়া-মহাদেব।

---

* 'Homage to Khajuraho' by Mulk Raj Anand & ors.

এটি এখানকার বৃহত্তম ও উচ্চতম মন্দির। ১০৯ ফুট দীর্ঘ ও ৫৯ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। মাটি থেকে শিখরের উচ্চতা ১১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরের মেঝে মাটি থেকে ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু।"

"তার মানে মেঝে থেকে মন্দিরশিখর কত উঁচু?" কিশোরী প্রশ্ন করে।

গাইড মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "তুমিই বল না।"

কিশোরী একটুকাল চুপ করে থাকে। মনে মনে হিসেব করে বলে ওঠে, "৮৮ ফুট।"

"পাশ করেছো, ধন্যবাদ!"

কিশোরী খুশি হয়।

গাইড আবার শুরু করেন, "এ-মন্দিরের মূল নকশা ও পরিকল্পনা (Plan and Design) উত্তর-ভারতের অন্যান্য মধ্যযুগীয় বড় মন্দিরের মতই।..."

"যেমন?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

গাইড উত্তর দেন, "এতেও তোরণ, অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং অন্তরাল গর্ভগৃহ ও প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে।"

"এ-মন্দিরেও তো দেখছি লক্ষ্মণা মন্দিরের মতো পৃথক পৃথক পিরামিড-শিখর!" সৌরীনবাবু বলেন।

কিন্তু গাইড কিছু বলতে পারার আগেই রণজিৎ বলে ওঠে, "তবে মূল শিখরটি কিন্তু অন্যান্য মন্দিরের মতো হয়েও তুলনাহীন।"

রণজিৎ ঠিকই বলেছে—মূল শিখরের চারিপাশে ছোট ছোট শিখর। আস্তে আস্তে নিচু থেকে উঁচু এবং ছোট থেকে বড় হয়েছে। শিখরটির দিকে তাকালেই মুল্‌ক রাজ আনন্দের সেই মন্তব্য মনে পড়ে।

গাইডও একই কথা বলেন, "মূল শিখরটি শিবালয় কৈলাসের প্রতীক। তিরাশীটি ছোট ছোট শিখর আছে বড় শিখরটির চারিপাশে। ছোট থেকে বড় আর নিচু থেকে উঁচু এই শিখরগুলো তৈরি করে বোঝানো হয়েছে—সত্য ও সুন্দর শিবের সান্নিধ্যলাভ করতে হলে সাধনার দ্বারা নিজেকে ধীরে ধীরে উন্নত করে তুলতে হয়।" একবার থামেন গাইড, তারপরে আবার বলেন, "এবারে জুতো খুলুন। চলুন, ওপরে ওঠা যাক।"

"কিন্তু আমরা কি পারব, আমাদের যে সাধনা নেই।" গৌতম হাসতে হাসতে বলে।

হাসতে হাসতেই উত্তর দিই, "সাধনা না থাকলে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করতে পারবে না, তবে সিঁড়ি ভাঙতে পারলে তাঁর মূর্তি দর্শন করতে পারবে।"

সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। উঠে আসি জগতীর উপরে। আগেই বলেছি, খাজুরাহে কোন মন্দিরের চারিপাশে পাঁচিল নেই। আর তাই এত উঁচু জগতী। এরকম উঁচু আর মজবুত বাঁধানো সমতলের (Platform) উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই মন্দিরগুলো আজও এমন অক্ষত রয়েছে।

অধিষ্ঠানটি ( Plinth ) দেখেই বোঝা যাচ্ছে মন্দিরের গড়ন কত শক্তিশালী। অধিষ্ঠানেও প্রচুর কারুকার্য এবং মূর্তি রয়েছে, কোথাও কোথাও দু-সারি মূর্তিমালা।

তারই একগুচ্ছ মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন, 'On the way to hunt.'

ঢাল-তরোয়াল, তীর-ধনুক, বল্লম ও বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল পুরুষ সারি বেঁধে পথ চলেছে। তাদের কারো খালি গা কারো গায়ে জামা, কারো মুখে দাড়ি-গোঁফ কারো বা কামানো। তবে সবারই মালকোঁচা ধুতি, মাথায় বাবরি চুল আর গায়ে গয়না। ওদের সঙ্গে গরু ছাগল ও কুকুর, ওরা শিকারে চলেছে।

রণজিৎ জিজ্ঞেস করে, "কুকুর বুঝতে পারছি, কিন্তু গরু-ছাগল কেন ?"

গৌতম উত্তর দেয়, "গরু বোধ হয় শিকার বয়ে নিয়ে আসার জন্য। অবশ্য ঘোড়া হলে আরও ভাল হত। আর ছাগল নিশ্চয়ই শিকারীদের ভুরিভোজের প্রয়োজনে।"

"কিন্তু ওরা তো শিকারেই যাচ্ছে!"

"যদি কোনদিন শিকার না জোটে, সেদিন কি খাবে ?"

'The passion of the Shilpin'—গাইড আরেক সারি মূর্তিকে দেখিয়ে বলেন।

আমরা দেখি—একজন মোটাসোটা দাড়িওয়ালা মানুষ হাতুড়ি ও বাটালি নিয়ে কাজ করছেন। ছ'জন মজুর একখানি কাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে কয়েকখানি পাথর বয়ে নিয়ে আসছে। সব মজুরদের মূর্তিগুলো অক্ষত নেই, তাহলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে এইভাবে সেকালে মন্দির তৈরি করা হত।

"আচ্ছা, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।" সৌরীনবাবু সহসা বলে ওঠেন, "এত উঁচু মন্দির কেমন করে তৈরি করলেন ? মানে এত বড় বড় পাথর কেমন করে তাঁরা অত উঁচুতে তুললেন ?"

"কেন তারা বেঁধে, মাচা তৈরি করে?" রণজিৎ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

আমি বলি, "ভারা বেঁধে বোধ হয় সম্ভব হয় নি। কারণ দড়িতে ঝুলিয়ে এত ভারী ভারী পাথর অত উঁচুতে তোলা যেমন কষ্টক, তেমনি খুব ভাল ভাবে না দাঁড়িয়ে এত সূক্ষ্ম কাজ করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া সেকালে কপিকল পর্যন্ত ছিল না।"

"তাহলে কি ভাবে তাঁরা এত উঁচু মন্দির তৈরি করলেন?"

"অনেকে অনুমান করেন, সেকালে নিচের দিক থেকে মন্দির তৈরি শুরু করা হত। একসারি পাথর লাগানো হবার পরেই বাইরের দিক থেকে মাটি দিয়ে উঁচু করে দেওয়া হত। সেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে স্থপতিরা তার পরের সারি পাথর লাগাতেন। তারপরে আবার মাটি দিয়ে উঁচু করা হত।"

"তাহলে শেষ পর্যন্ত তো সারা মন্দিরটাই মাটির ভেতরে চলে যেতো!"

'হ্যাঁ, বাইরের দিকটা। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হত না। মন্দির তৈরি হয়ে যাবার পরে মাটি সরিয়ে ফেলে দেওয়ালগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হত। এতে সেই মাটির স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে স্থপতিরা যেমন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারতেন, তেমনি সহজে সেখানে ভারী ভারী পাথর ও মূর্তি নিয়ে যাওয়া যেতো।"

'The call of war.'

গাইডের কথায় আমাদের আলোচনায় যতি পড়ে। আমরা সেই মূর্তি-মালার দিকে তাকাই। হাতি-ঘোড়া ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহু লোক যুদ্ধে যাচ্ছেন।

তাঁদের পাশের মূর্তিগুচ্ছটি দেখিয়ে গাইড বলেন, 'The thick of the fight.'

হাতির সঙ্গে হাতির, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। মুখোমুখি হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানছে।

অধিষ্ঠানে আরও অনেক মূর্তি রয়েছে। রয়েছে গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী ও ভক্তদের মূর্তি। মাঝে মাঝে সুসজ্জিত সিংহাসনে দেব-দেবীরা বসে আছেন। তবে এগুলো আকারে ছোট এবং এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ ( Three-dimensional effect ) তেমন সুস্পষ্ট নয়।

অধিষ্ঠানের ওপরে মন্দিরের দেওয়ালে তিনসারি মূর্তিমালা—খাজুরাহের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আকারে বড় এবং প্রতিটি মূর্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ অত্যন্ত

সুস্পষ্ট। তাঁরা যেমন নিখুঁত, তেমনি সুন্দর। দেব-দেবী, সুরসুন্দরী, নরশার্দুল, নাগিনী ও মিথুনমূর্তি। অলিন্দগুলো ( Balcony ) বাদ দিলে প্রায় সারা মন্দির জুড়েই মূর্তিমালা। তবে মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহের গায়ে সব চেয়ে সুন্দর ও সুন্দর মূর্তি।

নরশার্দুল ও নাগিনীদের মূর্তিগুলি বোধ করি আমার কিশোর সঙ্গিনীকে বেশি আকর্ষণ করছে। আর তাই সে গাইডকে জিজ্ঞেস করে, "এরা কে?"

গাইড উত্তর দেন—'The serpent goddesses and the composite mythical tigers.' সর্পদেবী আর রূপকথার বাঘ।

এই তিনসারি মূর্তিমালার ওপরেও মূর্তি রয়েছে। যেখানে মূর্তি নেই, সেখানে অপরূপ কারুকার্য। এক কথায় মন্দিরের সর্বত্র অত্যন্ত উন্নতমানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম। অথচ একঘেয়েমির দোষমুক্ত। কেবল সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার ধৈর্য নেই দর্শনার্থীদের। তাই তারা কেবল মিথুনমূর্তি কয়টির সামনে সমানে ঘুরঘুর করছে।

"আচ্ছা, এ মন্দিরে কতগুলি মূর্তি আছে?"

"সব মিলিয়ে ৮৭২টি। তার মধ্যে বাইরে ৬৪৬টি এবং ভেতরে ২২৬টি। অধিকাংশ মূর্তি আড়াই থেকে তিন ফুট দীর্ঘ।" গাইড একবার থামেন। তারপরে তিনি আবৃত্তি করে যান, '...the loftiest monument of Khajuraho...its mature plan and design, its grand dimensions and symmetrical proportions, its superb sculptural embellishment and architectural elaboration—all mark out as the most evolved and finished achievement of the Central Indian building-style and one of the sublimest creations of Indian architecture.'*

"আচ্ছা, কবে এ মন্দির তৈরি হয়েছে?" গাইড থামতেই কিশোরী প্রশ্ন করে।

ওর প্রশ্ন শুনে খুশি হই। উত্তর দিই, "ঠিক কবে তৈরি শুরু ও শেষ, তা বলা মুশকিল। তবে ১০১৭ থেকে ১০২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজা বিদ্যাধরের রাজত্বকালে এ মন্দির নির্মিত হয়েছে।"

* 'Khajuraho'—Archaeological Survey of India

"তার মানে এটা অন্তত সাড়ে ন'শ' বছর আগের মন্দির!"

আমি মাথা নাড়ি।

একটি মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলে ওঠেন, "সুরসুন্দরী বল নিয়ে খেলা করছেন, তার মানে হাজার বছর আগেও ভারতে বল খেলার প্রচলন ছিল এবং মেয়েরাও বল খেলত।"

"আর, এখন ছেলেরাও বাইরে বল খেলতে গিয়ে সবার সঙ্গে হেরে আসে।" সৌরীনবাবুর মন্তব্যে আমরা হেসে দিই।

তারপরে তাকাই মূর্তিটির দিকে—মেয়েটির মাথায় মুকুট, হাতে পায়ে কানে ও কোমরে অলঙ্কার, পরনে শাড়ী গায়ে কাঁচুলি ও বুকে ওড়না—হাওয়ায় উড়ছে। তার ডান হাতে একটি বল। সে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বল ছুঁড়ছে।

গাইড আবার থামেন। মেয়েটির পায়ে কাঁটা ফুটেছে। তারও গায়ে গয়না, মাথায় মুকুট। মুখখানি ভারী সুন্দর—উঁচু নাক, টানা-টানা চোখ। ডান হাত দিয়ে ডান পা-খানি তুলে ধরে সে তার পায়ের কাঁটা তুলছে।

একটি মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন, 'A shy-bride, hesitates to enter the room of her lover.'

নববধূ দু-পা জোড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে লজ্জা। গালে হাত দিয়ে ভাবছে—দয়িতের কুঞ্জকুটিরে এখুনি যাওয়া উচিত হবে কিনা?

পাশের মূর্তিটি দেখিয়ে গাইড বলেন, 'A mature woman turning her face away in an attitude into which the sculptor ha infused a sense of drama.'

মেয়েটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে আছে। তার পিঠ, বুকের একাংশ, ডান হাত ও মুখখানি দেখা যাচ্ছে। নিম্নাঙ্গের কেবল পেছনদিকটাই রয়েছে এদিকে। তার মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টি সত্যি নাটকীয়।

আরেকটি সুরসুন্দরীর দিকে ইসারা করেন গাইড। মেয়েটির মাথায় মুকুট, গায়ে গয়না, পায়ে নূপুর। আগের দুটি মূর্তির মতো এর পা-দুটিতেও এমন একটা ছন্দ আছে যেন সে এখুনি চলা শুরু করবে।

অথচ মেয়েটি পেছন ফিরে এদিকে তাকিয়ে আছে। শরীরের সামনের দিক দেখা যাচ্ছে না, কেবল তার মুখখানি এদিকে ফেরানো। একখানি বিনম্র হাত দিয়ে সে তার আধখোলা চোখ ও মুখের একাংশ ঢেকে রেখেছে।

তার সারা শরীরে একটা আশ্চর্য সুন্দর সারল্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। বোধ করি পথ চলতে চলতে সহসা দয়িতের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরগাত্রের মূর্তি দর্শন করতে করতে আমরা গাইডের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। একটি সুরসুন্দরীর দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াই। মেয়েটি একখানি হাত বুকের ওপর রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। তার সারা শরীরের সামনের দিক দেখা যাচ্ছে। সে সিক্ত-বসনা। মনে হচ্ছে এইমাত্র ঝরণায় অবগাহন সেরে এসেছে। তার মুখখানি বাঁদিকে ফেরানো। ফলে মুখের শুধু ডানদিকটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বোধ করি কারও পদশব্দ শুনতে পেয়েই সে ওদিকে ফিরেছে। আর তারই ফলে যুবতীর মুখের প্রশান্তি গিয়েছে ঘুচে। একটা মধুর উত্তেজনায় সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আরেকজন সুন্দরী দেবদাসী একটা কমণ্ডলু নিয়ে মন্দিরে চলেছে। পাত্রটি পরিপূর্ণ, কারণ মাঝে মাঝে সেটি থেকে পানীয় পড়ে যাচ্ছে। দেবদাসীর মাথায় বিচিত্র-সুন্দর খোঁপা, গলায় কানে বাজুতে কটিবন্ধে কোমরে ও পায়ে অলঙ্কার। সে ডানদিকে তাকিয়ে পেছন ফিরে রয়েছে। তার মুখ ও বুকের একাংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। আর তাতেই তার রূপলাবণ্য অনুমান করতে পারছি, চোখ ফেরানো যাচ্ছে না।

তবু ফেরাতে হয়। চলতে হয় এগিয়ে। আমরা সৌন্দর্যের সাধক নই, আমরা যে বিংশ শতকের ব্যস্ত পর্যটক।

তাহলেও মাত্র কয়েক পা এগিয়েই আবার দাঁড়াতে হয়। আরেকটি প্রসাধনরতা সুরসুন্দরী। নাচের ভঙ্গিমায় আমাদের দিকে ফিরে আয়নায় মুখ দেখছে। কিন্তু মুখের শুধু ডান দিকটাই দেখা যাচ্ছে। তার এক হাতে আয়না, আরেকখানি হাত মাথার ওপরে। বোধ করি কেশবিন্যাসে ব্যস্ত। অপরূপ মুখশ্রী, অনিন্দ্যসুন্দর স্বাস্থ্য—উন্নত বক্ষ, সঙ্কীর্ণ কটিদেশ, গায়ে নানা রকমের অলঙ্কার।

গাইড বলেন, 'The full bloom of this celestial beauty...... sculptured by generations of craftsmen in the subsequent eras.'

ঠিকই বলছেন গাইড। পরিপূর্ণ দিব্যনারী, পুরুষানুক্রমিক শিল্পসাধনার সার্থক সৃষ্টি।

তবে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। দাঁড়ালে যে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। এমন সুরসুন্দরী ও অপরূপ দেব-দেবীরা যে ছড়িয়ে আছেন সারা মন্দিরে!

আর প্রায় প্রতি দেওয়ালেই দু-চার জোড়া মিথুনমূর্তি রয়েছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে তারই এক-সেট মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন—'Plural intercourse. This orgistic scene presumably of the Hindu Kaula ( noble ) cults, in which the forms are held together by the unity evolved from inner tension of desire, sublimated into a Yogic trance.'

দক্ষিণ গাত্রের আরেক সেট মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন—এটি খাজুরাহের সব চেয়ে বিখ্যাত মিথুনমূর্তি। গাইডের ভাষায়, "Another Plural Intercourse—one man is satisfying three women at a time. But this sexual pose 'seems almost like a Yoga exercise, obviously one of the Kaula-Kapalika practices. The serenity of the male figure standing on his head and the acceptance by the maids assisting the conjugation, would suggest a ritualistic performance, noble perhaps for the difficulty of the pose and inevitably practised only by accomplished adepts."*

আগেই বলেছি আমরা ব্যস্ত পর্যটক, সৌন্দর্যের সাধক নই, সুতরাং আমাদের পক্ষে পৃথকভাবে প্রতিটি মূর্তিকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তবে এ মন্দিরের কোন অংশই অর্থহীন নয়। প্রায় প্রত্যেকটি মূর্তি সংবেদনশীল শিল্পীদের কলাকুশল ও ধর্মবোধের পরিচয় দিচ্ছে। মনে হচ্ছে—মন্দিরটি সর্বশক্তিমানের শরীর, আর মূর্তিমালা তাঁর শক্তি। তাঁরা এই মন্দিরগাত্রে সর্বশক্তিমানের সকল শক্তিকে সর্বপ্রকারে প্রকাশ করছেন।

স্থাপত্যের বিচারে মূর্তিমালা মন্দিরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের মন্দিরে জংঘা ( দেওয়াল ) সর্বদা অর্থবহ। যে পাথর কিংবা ইট দিয়ে মন্দির নির্মিত হয়, ভারতীয় স্থপতিরা তাকে পর্যন্ত দেবী অর্থাৎ প্রকৃতি রূপে জ্ঞান করে থাকেন।

এ-মন্দিরের ভাস্কর্য স্থাপত্যের পরিপূরক। আর এই মূর্তিমালার মাধুর্য, ভারসাম্য ও সমাহিত ভাব সম্পর্কে গাইড বলছেন—'The sculptures on the temple walls are empowered by the drive within the plan and substance of the building. Architectural vitality

* 'Homage to Khajuraho.'

supports their sculptural graces···they appear effortless in their balance, absorption and three-dimensional presentation ……..Viewed from any other angle their high relief has a quality of its own,....particularly of the face, and especially if the face is to be seen in profile view·······'*

আগেই বলেছি মন্দিরগাত্রের প্রায় সব জায়গাতেই মূর্তি স্থাপিত। কেনই বা থাকবে না ? এখানে তো মন্দির গড়ে মূর্তি বসানো হয়নি, মূর্তি দিয়ে মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এত মূর্তি, এমন সূক্ষ্ম তাদের ভাস্কর্য, তবু দেখে দেখে চোখ দুটি কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না। পুনরাবৃত্তির বিরক্তি কিংবা একঘেয়েমিতে চঞ্চল হয়ে উঠছি না। আশ্চর্য, আমাদের মতো নীরস দর্শকও কঠিন পাথর থেকে রস আহরণ করছে !

সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরতোরণে—পঞ্চপাত্র মকরতোরণ। একটি নয়, দুটি তোরণ। যেমন মনোরম গড়ন, তেমনি অপরূপ কারুকার্য। চোখ ফেরানো যায় না।

তবু ফেরাতে হয়। কারণ আগেই বলেছি—আমরা বিংশ শতকের ব্যস্ত পর্যটক। তবে একটা কথা বলতেই হবে। আগের সমস্ত মন্দিরের চেয়ে এর তোরণটি অনেক বড়। আর এ কথা কেবল তোরণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, সারা মন্দিরটির পক্ষেই সমান সত্য। এর প্রত্যেকটি অংশ বেশ বড বড়। এবং আড়ম্বরপূর্ণও বটে। গাইডের ভাষায়—'more spacious and gorgeous and is replete with a lavish wealth of curvings and sculptures.' **

কথাটা মিথ্যে বলেন নি ভদ্রলোক। এর গড়ন এবং অঙ্গসজ্জায় এমন একটা রমণীয় সৌন্দর্যবোধ, কমনীয় ছন্দ আর ঐক্য আছে, যা খুব কম মন্দিরেই দেখেছি।"

আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আর চলতে চলতে ভাবছি—স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই অপূর্ব সঙ্গতি, এই ছন্দময় ঐক্যই কাণ্ডারিয়া-মহাদেব মন্দিরের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

* 'Homage to Khajuraho.'

** 'Khajuraho' by Krishna Deva.

শুধু তাই নয়, শিল্পীরা এই ঐক্যবোধকে দর্শনার্থীদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছেন। আমরা মন্দিরের এক-একটি অংশ পার হচ্ছি আর এক-এক ধাপ করে ওপরে উঠছি। অর্ধমণ্ডপ থেকে মণ্ডপ উঁচু, মণ্ডপ থেকে মহামণ্ডপ উঁচু, মহামণ্ডপ থেকে গর্ভমন্দির আরেকটু উঁচু। আবার গর্ভমন্দিরে উঁচু বেদির ওপরে বিগ্রহ স্থাপিত। ফলে ভক্তবৃন্দ এক এক ধাপ করে ওপরে উঠে অবশেষে ভগবানের সন্নিধানে এসেছেন।

গর্ভগৃহের দরজায় চমৎকার কারুকার্য ও ভাস্কর্য। কারুকার্য সাতটি শাখায় বিভক্ত।

মন্দিরের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ। কষ্টিপাথরের অপরূপ লিঙ্গমূর্তি। গাইড জানান—এই শিবলঙ্গের পরিধি চার ফুট।

আমরা দর্শন করি, অনিন্দ্যসুন্দর মন্দিরের শাশ্বতসুন্দর শিবকে প্রণাম করি।

তারপরে মূর্তিময় প্রদক্ষিণ পথ ধরে শুরু করি গর্ভগৃহ পরিক্রমা।

শেষ হয় রূপতীর্থ খাজুরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির-দর্শন।

## ॥ বারো ॥

বলতে গেলে একই জগতীর ওপরে দুটি মন্দির—কাণ্ডারিয়া-মহাদেব ও জগদম্বা মন্দির। তাই আমাদের আর সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। কাণ্ডারিয়া..কে বাঁদিকে রেখে জগতীর ওপর দিয়েই উত্তরে এগিয়ে চলি।

দুই মন্দিরের মাঝখানে ছোট একটি মন্দির। পণ্ডিতরা বলেন—এটিও মহাদেব মন্দির এবং কাণ্ডারিয়ার সঙ্গেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ দর্শনার্থীদের কাছে এখন এটি আর কোন ঠাকুর-দেবতার মন্দির নয়, মানুষের স্মৃতিসৌধ। ছোট মন্দিরের ছোট মণ্ডপ জুড়ে সিংহের সঙ্গে সংগ্রামরত একজন মানুষ। এই মহাবীর চান্দেলা রাজবংশের আদিপুরুষ। কথিত আছে তিনি খালিহাতে একটি সিংহকে বধ করেছিলেন। তাঁর এই মূর্তিটি চান্দেলা রাজ-বংশের প্রতীক। এইখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। আসলে শব্দটা কিন্তু 'চন্দেল্ল'। অথচ স্থানীয়রা বোধ হয় কানের তাগিদে চান্দেলা বলেন। আমিও তাঁদের এই সহজ উচ্চারণ মেনে নিয়েছি।

যাক্‌গে যে কথা বলছিলাম—পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—এই প্রতীক মূর্তিটি অন্য কোন স্থানে স্থাপিত ছিল। পরবর্তীকালে রোদ ও জল থেকে বাঁচাবার জন্য একে এখানে এনে রাখা হয়েছে।

তাঁদের অনুমান বোধ করি মিথ্যে নয়। কারণ মণ্ডপটির তুলনায় মূর্তিটি খুবই বড়। সেকালের রাজারা এত বড় মূর্তির জন্য এতটুকু মন্দির তৈরি করতে পারেন না।

খালিহাতে সিংহ মারার কথাটি আমার কিশোর সঙ্গিনীকে কৌতূহলী করে তুলেছে। সে বলছে, "তাহলে সেকালে এসব জায়গায় অনেক সিংহ ছিল আর সেকালের মানুষরাও একালের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন।"

এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহে কিশোরীর বক্তব্য সমর্থন করছে। সুতরাং মাথা নেড়ে এগিয়ে চলি।

কয়েক পা এগিয়েই জগদম্বা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। কাণ্ডারিয়ার থেকে ছোট হলেও বেশ বড় মন্দির। গাইড বলেন, "৭৭ ফুট দীর্ঘ ও ৪৯ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। তবে মন্দিরটি মাত্র চারটি অংশে বিভক্ত। এর কোন অর্ধমণ্ডপ ও প্রদক্ষিণ পথ নেই। কিন্তু এ মন্দিরের পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কোনমতেই লক্ষ্মণা কিংবা কাণ্ডারিয়ার চেয়ে নিম্নমানের নয়।"

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি গাইড কথাটা মোটেই মিথ্যে বলছেন না। এই মন্দিরের দেওয়ালেও তেমনি তিনসারি মূর্তিমালা। প্রতিটি মূর্তি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমন্বিত। যেমন সুন্দর, তেমনি জীবন্ত। মন্দিরের অলঙ্করণও চমৎকার। তবে অধিষ্ঠানের ওপরে কোন মূর্তি নেই। এই তিনসারি মূর্তিমালার ওপরে কিংবা নিচে অতিরিক্ত মূর্তির সংখ্যা খুবই সামান্য।

"আচ্ছা, এ মন্দির কবেকার তৈরি?" রণজিৎ জিজ্ঞেস করে।

গাইড বলেন, "একাদশ শতাব্দীর।"

"অর্থাৎ চান্দেলা রাজত্বের সব চেয়ে গৌরবময় যুগে।" গৌতম যোগ করে।

আমি মাথা নাড়ি।

গাইড দুটি বিচিত্র মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি বরাহ অবতার ও আরেকটি শিবমূর্তি। মহাদেবের তিন মুখ ও আট হাত। এমন অদ্ভুত মহেশ্বরমূর্তি আমি এর আগে আর দেখি নি।

গাইড বলেন—'These two are excellent images of iconographical interests.'

পুবমুখী মন্দির। পরিক্রমা শুরু করি। এটি কাণ্ডারিয়ার দিক অর্থাৎ মন্দিরের দক্ষিণ গাত্র। মন্দিরগাত্রের মূর্তিমালা দেখতে দেখতে আমরা পশ্চিমে অর্থাৎ মন্দিরের পেছনদিকে চলেছি।

একটি প্রসাধনরতা সুরসুন্দরী। তার চমৎকার চুলের বাহার। সে সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। টানা-টানা চোখ, উঁচু নাক, উন্নত বক্ষ অথচ সঙ্কীর্ণ কটিদেশ। মেয়েটির বাঁ হাত মাথার ওপরে, ডান হাতে একখানি আরশি। সে নাচের ভঙ্গিতে প্রসাধনরতা।

একজোড়া নারী-পুরুষ। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল মিথুনমূর্তি, কিন্তু কাছে এসে বুঝতে পারছি তারা চুম্বনরত পর্যন্ত নয়, কেবল ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে আবদ্ধ। তাদের গভীর মমতায় দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। আশ্চর্য সুন্দর এবং প্রাণময় মূর্তি।

গাইড মন্তব্য করেন—'Tenderly merge the bodies into each other.'

এখানে কয়েকটি মিথুনমূর্তিও রয়েছে। আর তারই একজোড়া মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন—'The union, cosmic principles.'

এগিয়ে চলি। আরেকজোড়া মূর্তির সামনে আবার থামতে হয়। অপরূপ ভাস্কর্য। দুজনেরই গায়ে মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার। ছেলেটির মাথায় শিরস্ত্রাণ, মেয়েটির মাথায় খোঁপা। ছেলেটি কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। সে স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ যুবা। তবে তার মুখের কেবল ডানদিকটাই দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটিও স্বাস্থ্যবতী তবে ছেলেটির চেয়ে কিছু খাটো। সে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে, কেবল মুখের বাঁদিকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতেই তার অপরূপ রূপ ঠাহর করতে পারছি।

ছেলেটি দুহাতে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়েছে, মেয়েটি পরম নিশ্চিন্তে তার প্রিয়তমের বক্ষলগ্না। মনে হচ্ছে পাথরের প্রতিমূর্তি কিংবা স্বর্গের দেব-দেবী নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ—মর্ত্যের মানব-মানবী। তারা চুম্বনরত। কিন্তু মূর্তি দুটির মধ্যে কোন অশ্লীলতা খুঁজে পাচ্ছি না। বরং মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

গাইড মন্তব্য করেন—'Tenderness in love.'

ঠিকই বলেছেন—দরদী প্রেমিক, কোমল ভালোবাসা। প্রেমময় মানব-মানবী জীবনধর্ম পালন করছে।

আমরা পশ্চিম গাত্রে অর্থাৎ মন্দিরের পেছনদিকে এসেছি। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং ব্রহ্মা-সরস্বতীর দুটি ভারী সুন্দর যুগলমূর্তি রয়েছে এদিকে। আরও অনেক দেব-দেবী এবং সুরসুন্দরীর মূর্তি আছে। আছে কয়েকটি মিথুনমূর্তি।

বলা বাহুল্য সেগুলির সামনেই ভিড় বেশি। আমাদের দলেরও কেউ কেউ সেখানে সময় কাটাতে চায়, কিন্তু গাইডের তাগিদে পেরে ওঠে না।

গাইড এগিয়ে চলেছেন, আমরাও চলতে চলতে দেখছি। দেখছি সুর-সুন্দরীদের, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে, লক্ষ্মী-নারায়ণ ও হর-পার্বতীকে। যমরাজের একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি রয়েছে এই দেওয়ালে, আর রয়েছে কয়েকটি মিথুনমূর্তি।

পরিক্রমা পূর্ণ হল, ফিরে এলাম মন্দিরের সামনে। এখান থেকে একসারি সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, আরেকসারি উঠেছে ওপরে—মন্দিরতোরণে। তোরণের দু-পাশে দুটি ব্যাল্‌কনী। তারই ফাঁকে ফাঁকে মূতিমালা। কিন্তু আমরা এ-সব মূর্তি দেখে গিয়েছি একটু আগে। তাই সারি বেঁধে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি।

চোদ্দ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি তোরণে। তারপরে প্রবেশ করি মন্দিরে—জগদম্বা মন্দিরে। লক্ষণা কিংবা কাণ্ডারিয়ার মতো কারুকার্য কিংবা মূর্তিমালা নেই, তাহলেও ভেতরটা ভারী সুন্দর। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

মণ্ডপের মাঝখানে যজ্ঞবেদি। আমরা ছাড়িয়ে আসি। এসে দাঁড়াই গর্ভগৃহের দ্বারে। দরজার ওপরে অর্থাৎ ললাটবিম্বের মাঝখানে বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণুর বাঁদিকে মহেশ্বর, ডানদিকে পিতামহ ব্রহ্মা।

"এটি কি মা-কালীর মূর্তি?" একটি মূর্তি দেখিয়ে গৌতম প্রশ্ন করে।

গাইড উত্তর দেন, "না, আপাতদৃষ্টিতে কালীমূর্তি বলে মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে অসমাপ্ত গঙ্গামূর্তি। আর তাই বোধ করি ভুলটা হয়েছে।"

"ভুল!" আমরা বিস্মিত।

"হ্যাঁ, ভুল।" গাইড বলেন, "পণ্ডিতদের ধারণা ভুল করে এই মন্দিরকে জগদম্বা বলা হচ্ছে, নইলে এটি প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুমন্দির আর তাই ললাট-বিম্বের কেন্দ্রস্থলে বিষ্ণুমূর্তি খোদিত। ভেতরে চলুন। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা তাঁর সঙ্গে গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। গাইড প্রথম আমাদের একটি

যমমূর্তি দেখালেন। ভয়ানক মূর্তি, দেখতে ভয় হয়। তারপরে তিনি দাঁড়ালেন মূল বিগ্রহের সামনে।

এ মন্দিরেও পুজো-পাঠ হয় না, তবু কারা যেন মাকে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে গিয়েছেন। অন্যান্য মন্দিরেও বিগ্রহ রয়েছেন কিন্তু তাঁদের তো কেউ ফুল দেয় না! এটি বোধ করি কালীমায়ের বিশেষ পাওনা।

"এই তো মা-কালীর মূর্তি, তাহলে এ মন্দিরকে বিষ্ণুমন্দির বলছেন কেন?" সৌরীনবাবু প্রশ্ন করেন। কিশোরীর বাবা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করেন তাঁকে।

গাইড মৃদু হাসেন। বলেন, "এই ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ চতুর্ভুজা মূর্তিটিকে কালীমূর্তি ভেবে কেউ কিছুকাল আগে এঁর গায়ে কালো রং করে দিয়েছেন। আসলে এটি লক্ষ্মীমূর্তি।"

"কেমন করে বুঝলেন?" কিশোরী কৌতূহলী।

গাইড বিগ্রহের আরও কাছে এগিয়ে যান। বলেন, "এই দেখো, মূর্তির হাতে একটি পদ্মফুল রয়েছে।"

সৌরীনবাবু আর কোন আপত্তি করেন না। আমরাও নীরবে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি মন্দিরতোরণে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে।

জগতীর ওপরে দাঁড়িয়ে আরেকবার মন্দিরটিকে দেখি। তারপরে আবার তেরো ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি পথে। এগিয়ে চলি উত্তরে—চিত্রগুপ্ত মন্দিরে।

চোদ্দ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম জগতীর ওপরে—চিত্রগুপ্ত মন্দিরে। জগতীর উচ্চতা প্রায় কাণ্ডারিয়া মন্দিরের মতো।

এটি খাজুরাহের একমাত্র সূর্যমন্দির। আয়তন এবং স্থাপত্যকলায় জগদম্বার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। মন্দিরটি ৭৪ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। এ মন্দিরেও কোন অধমণ্ডপ এবং প্রদক্ষিণ পথ নেই। তবে মন্দিরের অলঙ্করণ জগদম্বার চেয়ে কিছু উন্নত।

গাইড বলেন, "১০০০ থেকে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ মন্দিরটি নির্মিত।"

জগদম্বায় অধিষ্ঠানের ওপরে শুধু নক্শা দেখেছি, এ মন্দিরে কিন্তু কিছু মূর্তি রয়েছে—শিকার, নাচ-গান, মন্দির নির্মাণ ও হাতির যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন দৃশ্য খোদিত।

পূর্বমুখী মন্দির। এই সামনের দিকে বেশ কয়েকজন সুরসুন্দরী রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাদের একজনে ' দিকে গাইড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মেয়েটির স্বাস্থ্য ভাল, চমৎক'র পোশাক। তার মুখের আদল ভারী সুন্দর কিন্তু বড়ই করুণ। গাইড বলেন, "এমন বিষাদগ্রস্ত মূর্তি খাজুরাহে আর নেই। খাজুরাহো ভক্তি ও আনন্দের জগৎ। সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের জয়গান গাইতে গিয়ে শিল্পী কেন এই ক্রন্দনরতা নারীমূর্তি নির্মাণ করলেন, কেউ বলতে পারছেন না।"

এ মন্দিরেও তেমনি তিনসারি মূর্তিমালা। তবে মূর্তির সংখ্যা কম। সুর-সুন্দরী, দেব-দেবী ও মিথুনমূর্তি। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

"এটি হচ্ছে এ মন্দিরের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তি।"

গাইডের কথা শুনে মূর্তিটির দিকে তাকাই।

কিশোরী জিজ্ঞেস করে, "অদ্ভুত মূর্তি তো! এটা কার মূর্তি?"

"বিষ্ণু এবং তাঁর দশ অবতারের। এক দেহ কিন্তু এগারোটি মাথা।"

আমরা মন্দির পরিক্রমা করছি। এটি মন্দিরের দক্ষিণ গাত্র। এদিকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি মূর্তি রয়েছে।

মন্দিরের পেছনদিকে আসি। এই পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছেন বিষ্ণু এবং হর-পার্বতী, রয়েছে কয়েকজন সুরসুন্দরী এবং একজোড়া চুম্বনরত নারী-পুরুষ—চমৎকার ভাস্কর্য। সঙ্গমের মূর্তি এ মন্দিরে প্রায় নেই বললেই চলে।

উত্তর গাত্র দর্শন করে আবার ফিরে আসি সামনে। এগারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি তোরণে। প্রবেশ করি মন্দিরে।

ছোট মহামণ্ডপ। কিন্তু যজ্ঞবেদি রয়েছে। আর রয়েছে সাতজোড়া দ্বারপাল। একটু আগে জগদম্বায় এমনি তিনজোড়া দ্বারপাল দেখে এসেছি।

গর্ভগৃহের দ্বারে আসি। ভেতরে সূর্যমূর্তি। তিনি রথের ওপরে দণ্ডায়মান। সাতটি ঘোড়া রথ নিয়ে চলেছে। তাঁর সারাগায়ে আলোর আভা।

"এ কি! ঠাকুরের পায়ে জুতো কেন?"

না, কিশোরীর নজর আছে বলতে হবে। সত্যই সূর্যের পায়ে একজোড়া 'গাম্-বুট'।

গাইড সহাস্যে বলেন, "সূর্যদেবকে তো বারোমাস ছুটোছুটি করতে হয়। তাই তিনি সব সময় জুতো পরে থাকেন।" একবার থামেন গাইড। তারপরে গর্ভ-মন্দিরের দরজা দেখিয়ে বলেন, "এই দেখো, এখানে ছোট্ট করে ঐ সূর্যমূর্তি খোদিত রয়েছে।"

আমরা দেখি। তারপরে প্রণাম করি দেব-দিবাকরকে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি—

'ওঁ জবা-কুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥'

চিত্রগুপ্ত মন্দির থেকে নেমে মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি পুবে। চিত্রগুপ্ত এই মন্দির-এলাকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আর বিশ্বনাথ উত্তর-পুবে—বড় রাস্তার ধারে। আমরা এখন বিশ্বনাথ মন্দিরে চলেছি—আজকের শেষ দর্শন।

বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে আরও দুটি মন্দির রয়েছে—পার্বতী ও নন্দী। সে দুটিও দেখতে হবে বৈকি!

প্রথমে পার্বতী মন্দিরে এলাম। বিশ্বনাথের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোট মন্দির। তবে সেকালে বোধ করি এর চেয়ে বড় ছিল। একালে কেবল গর্ভমন্দিরটি অক্ষত রয়েছে। ভেতরে গৌরীমূর্তি।

গাইড বলেন, "৪ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা।"[১২] একবার থামেন তিনি। তারপরে দরজা দেখিয়ে আবার বলেন, "এই দেখুন ললাটবিম্বে বিষ্ণুমূর্তি খোদিত। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন এটি বিষ্ণু মন্দির ছিল।"

কথাটা মেনে নিতে পারি না। তাই বলি, "তাঁদের অনুমান সত্য নাও হতে পারে। জৈন মন্দিরে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি থাকতে পারলে শৈব মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি থাকতে পারবে না কেন?"

পার্বতীকে প্রণাম করে আমরা বিশ্বনাথ মন্দিরে আসি। সিঁড়ির দু-পাশে দুটি হাতির মূর্তি। এটি দক্ষিণদিক। এদিকে হাতি, ওদিকে সিংহ। উত্তর ও দক্ষিণ দু-দিক থেকেই দু-সারি সিঁড়ি উঠে গিয়েছে জগতীর ওপরে।

আমরাও সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি। আমাদের বাঁদিকে বিশ্বনাথ ও ডানদিকে নন্দী মন্দির। আগে বাহনকে দর্শন করে নেওয়া যাক।

চারকোণা ছোট মন্দির। চারিদিক খোলা। বারোটি স্তম্ভের ওপর ছাদটি রয়েছে দাঁড়িয়ে। ৩১ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ৩০ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া মন্দির।

মন্দির নয়, আমরা বিশ্বনাথের বাহন নন্দীকে দেখতে এসেছি। তাকে দেখি। অপরূপ মূর্তি। সে পা গুটিয়ে বসে আছে। তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বনাথের

দিকে। একই সরলরেখায় মুখোমুখি দুটি মন্দির। দূরত্বও সামান্য। সুতরাং সে দেখতে পাচ্ছে তার পরম-প্রভুকে।

নন্দী মূর্তিটি বেশ বড়। গাইড জানায়—সোয়া সাত ফুট লম্বা ও ছয় ফুট উঁচু। ভারী সুন্দর, একেবারে জীবন্ত মূর্তি। একটা শান্ত-সমাহিত ভাব ফুটে আছে। তার মাথায়, গলায়, গায়ে ও পায়ে চমৎকার খোদাই কাজ। আমরা দেখি।

তারপরে নেমে আসি নন্দী মন্দির থেকে। জগতীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি পশ্চিমে। একই জগতীর ওপরে অবস্থিত পূবমুখী মন্দির। এটিও লক্ষ্মণার মতো পঞ্চায়তন মন্দির। তবে চারকোণের চারটি ছোট মন্দিরের মধ্যে কেবল উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মন্দির দুটি এখনও মাথা উঁচু করে রয়েছে দাঁড়িয়ে। অপর দুটি মহাকালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

লক্ষ্মণার পরে এবং কাণ্ডারিয়ার আগে অর্থাৎ ১০০২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই মন্দির-নির্মাণ শেষ হয়েছে। এই মন্দির-নির্মাণের পরেই কাণ্ডারিয়া নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এবং কাণ্ডারিয়া নিঃসন্দেহে মধ্যযুগে মধ্যভারতীয় মন্দির-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

তাই এ-মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও অলঙ্করণ বার বার আমাকে কাণ্ডারিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অধিষ্ঠানের ওপরে মন্দিরগাত্রে তিনসারি মূর্তিমালা। মূর্তিগুলো তেমনি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমন্বিত, তবে আকারে কিছু ছোট—দুই থেকে আড়াই ফুট দীর্ঘ। মূর্তির সংখ্যাও কম—সব মিলিয়ে নাকি ৬০২টি মূর্তি আছে এ মন্দিরে। তবে এটি আকারেও কাণ্ডারিয়ার চেয়ে অনেক ছোট—৮৯ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪৫ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া।

মন্দির এবং শিখরের গড়নটিও অনেকটা কাণ্ডারিয়ার মতো। তোরণ অর্ধমণ্ডপ মণ্ডপ মহামণ্ডপ অন্তরাল গর্ভগৃহ এবং প্রদক্ষিণ পথ—সবই আছে এ মন্দিরে। প্রথম চারটি অংশের পৃথক পৃথক শিখর আর শেষ তিনটি অংশের ওপরে মূল শিখর। শিখরগুলি ধাপে ধাপে উঁচু হয়েছে। মূল শিখরের চারিদিকেও ছোট ছোট শিখর। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে শীর্ষের কিছু নিচে শেষ হয়ে গিয়েছে। শিবালয় কৈলাসের ভাবনাটি বোধ করি এই মন্দির নির্মাণের সময়েই স্থপতিদের মনে প্রথম স্থান পেয়েছিল। আর পরবর্তীকালে কাণ্ডারিয়া মন্দির তৈরি করে তারা সেই স্বপ্নকে সত্য করে তুলেছেন।

মন্দিরটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে পরিক্রমা শুরু করি। সাত জননীর সঙ্গে গণেশ এবং বীরভদ্রের মূর্তিটি প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কিন্তু কোথাও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখবার অবকাশ নেই। এটিই শেষ দর্শন, এর পরেই আজকের মতো ছুটি। সুতরাং গাইডের গতি আরও বেড়েছে। এবং সে গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেই হবে। তারই মধ্যে যতটা সম্ভব দেখে নিচ্ছি।

অধিষ্ঠানে তেমনি সেকালের সমাজচিত্র খোদিত। আর জংঘার মূর্তিমালায় সুরসুন্দরী দেব-দেবী ও মিথুনমূর্তি। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

যুবতীটি পেছন ফিরে রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার পরনে চমৎকার পোশাক, গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার। শরীরটা উল্টোদিকে ঘোরানো হলেও সে কোমর বেঁকিয়ে মুখখানিকে এদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। আর তাতেই তার স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যকে ঠাহর করা যাচ্ছে। মেয়েটি বিচিত্র-সুন্দর ভঙ্গিতে চুল বাঁধছে।

এক হাতে কাগজ আরেক হাতে কলম। বিরহিনী সুরসুন্দরী প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশে প্রেমপত্র রচনা করছে। তার চোখ-মুখে গভীর মনযোগ, দেহে পুলকের শিহরণ। সে শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি।

অবগাহনের অনতিকাল পরে—আরেকটি অপরূপা যুবতী। সে স্নান সেরে সবে সরোবর থেকে উঠে এসেছে। এক হাত দিয়ে ভিজে যাওয়া ভারী চুল সামলাচ্ছে, আরেক হাত দিয়ে শাড়ী ধরে যৌবন-মেদুর দোদুল দেহটিকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পেরে উঠছে না। সিক্তবসন ভেদ করে উদ্ধত যৌবন প্রকট হয়ে পড়েছে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ গাইড বলে ওঠেন—'This beauty seems to be involved in the rhythm of her gracefully curved body.'

তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকাই। না না, গাইডের দিকে নয়, নারী মূর্তিটির দিকে। পা ভেঙে গিয়েছে, তবু তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা, চোখের দৃষ্টি আর শরীরের ভাঁজ দেখে মনে হচ্ছে—সারা শরীর থেকে কবিতার ছন্দের মতো, গানের সুরের মতো সৌন্দর্য ঝরে ঝরে পড়ছে।

দেব-দেবী ও সুরসুন্দরীদের মাঝে মাঝে মিথুনমূর্তি। চার দেওয়ালেই বিচিত্র ভঙ্গিতে সঙ্গমরত কয়েকজোড়া নারী-পুরুষের মূর্তি রয়েছে। এরকম মূর্তি আমরা অন্যান্য মন্দিরেও দেখে এসেছি। তাই গাইড কোথাও দাঁড়ান নি এতক্ষণ। আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ সঙ্গে কিশোরী রয়েছে।

কিন্তু এবারে থামতে হল। গাইড চলা থামিয়েছেন। আমাদের সামনে

দুজন পুরুষ ও দুজন নারীর নগ্নমূর্তি। মনে হচ্ছে একটি নারীকেই দুটি পুরুষের পছন্দ। অপর নারীটি অবহেলিতা।

গাইড বলেন—'The sage Vatsayana mentions in his Kama sutra sex union among a cóuple of husbands and their wives taking place in one act orgy. He thinks that great friendship and intimacy among the couples is necessary, because exchange may take place. The Kaula or Kapalika cults of Shaivasm, apparently exalted the orgies of union into ceremonies where the undertone of human modesty was gently transformed into religious frenzy. Some commentators still think orgies debased, but the sex literature at that age seems to show that the practices were common currency.'*

অবশেষে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি তোরণে। অর্ধমণ্ডপ ছাড়িয়ে মণ্ডপের দোরগোড়ায় দেখতে পাই সেই শিলালিপি। একখানি নয়, পাশাপশি দুখানি শিলালিপি দেওয়ালে লাগানো রয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে হালে লাগানো— সংরক্ষণের প্রয়োজনে।

দুখানাই সংস্কৃতে খোদিত। একখানি ছোট, আরেকখানি বড়। বড়টি এই মন্দিরেই পাওয়া গিয়েছে। ১০০২ খ্রীষ্টাব্দের লিপি। এতে নান্নুক থেকে ঢঙ্গ পর্যন্ত চান্দেলা রাজাদের বংশবৃত্তান্ত লেখা রয়েছে। বলা হয়েছে— মহারাজা ঢঙ্গ এই শিব-মরকতেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করে এখানে একটি পাথরের এবং একটি পান্নার লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু একই সময়ের—১০০১ খ্রীষ্টাব্দের। এতে লেখা রয়েছে কোক্কল নামে জনৈক রাজপুরুষ খাজুরাহের কাছে আরেকটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নগরীর বৈদ্যনাথ মন্দিরে এই শিলালিপি স্থাপিত ছিল।

শিলালিপি দেখে এগিয়ে চলি। ভেতরের ভাস্কর্যও দেখার মতো। বিশেষ করে সিলিঙের কারুকার্য। মা ও ছেলের একজোড়া চমৎকার মূর্তি রয়েছে। রয়েছে দেব-দেবী ও সুরসুন্দরীরা।

জনৈকা সুরসুন্দরীর দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াতে হয়। মেয়েটি

* 'Homage to Khajuraho.'

অতিশয় রূপবতী, চমৎকার সাজগোজ। কিন্তু তার রূপ ও পোশাকের সঙ্গে মনের মিল নেই। বোধ করি এইমাত্র কোন দুঃসংবাদ তার কানে এসেছে, সে অস্থির হয়ে পড়েছে। শিল্পী শুধু মুখ ও হাতের বিপরীত মোচড়ের মধ্য দিয়ে মেয়েটির মনের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহামণ্ডপে তেমনি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ আর মধ্যস্থলে উঁচু যজ্ঞবেদি। আমরা এগিয়ে চলি।

গর্ভগৃহের দ্বারে আসি। দরজার ওপরে—ঠিক মাঝখানে, নন্দীর পিঠে শিবমূর্তি খোদিত। তাঁর বাঁদিকে হংসযানে ব্রহ্মা ও ডানদিকে গরুড়ে সমাসীন বিষ্ণু।

গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করি। মন্দিরের মধ্যস্থলে উঁচু বেদির ওপরে বিশ্বনাথ—অনিন্দ্যসুন্দর লিঙ্গমূর্তি।

গাইড বলেন, "বিগ্রহের ব্যাস বারো ইঞ্চি।"

অন্যান্য বড় মন্দিরের মতো এখানেও প্রচুর আলো আসছে। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত মূর্তি। সারা বছর সারাদিন এই লিঙ্গমূর্তি আলোময় হয়ে থাকে। পাথরের মূর্তি যখন এমন জ্যোতির্ময়, তখন পান্নার মূর্তিটি থাকলে না জানি কেমন হত? তার প্রতিফলিত আলোয় নিশ্চয়ই সারা মন্দির উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। আর তাই মহারাজা ঢঙ্গ সেটি এখানে স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু লোভী মানুষ, স্বার্থপর লুটেরার দল সেটি অপহরণ করেছে।

করুক গে। তস্করেরা মহারাজা ঢঙ্গের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে পারে নি। হাজার বছর পরেও প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী তাঁর নির্মিত মন্দির দর্শন করতে আসছেন। যুগ-যুগান্তের সংখ্যাতীত ভক্তের হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁরা মনের আলোয় আলোকিত করে রূপতীর্থ খাজুরাহোকে বুকের মাঝে সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছেন। সুন্দরের বিনাশ নেই। সত্য সুন্দর শিবের মতো খাজুরাহো অবিনশ্বর। রূপতীর্থ খাজুরাহো চিরকাল বেঁচে থাকবে মানুষের মহৎ সৃষ্টির ইতিহাসে।

## ॥ তেরো ॥

আজ সকাল দশটায় গৌতমরা জবলপুর রওনা হয়ে গিয়েছে। ওরা ঠিকই করেছে। খাজুরাহে সবাই সাধারণত একদিন থাকেন, ওরা তো প্রায় দু'দিন

থেকে গেল। তবু আমি ওদের সঙ্গে খাজুরাহো ছাড়তে পারি নি। আমাকে আরও দুটি দিন থাকতে হবে এখানে। আমি একা একা ঘুরে ঘুরে আপনমনে রূপতীর্থকে আরও নিবিড় করে দর্শন করতে চাই।

তাই আজ রণজিৎদের বাস ছেড়ে দেবার পরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছি দুলাদেও আর পার্শ্বনাথ মন্দিরে। সেখান থেকে ট্যুরিস্ট্-বাংলোয় ফিরে দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরেছি। তারপরে আবার পথে নেমেছি। আরেকবার লক্ষ্মণা কাণ্ডারিয়া জগদম্বা চিত্রগুপ্ত ও বিশ্বনাথকে দেখেছি। দেখতে দেখতে গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। তাই আজ দেখা হয় নি মাতঙ্গেশ্বর, চৌষট্টিযোগিনী আর লালগুঁয়া মহাদেব মন্দির। যেতে পারি নি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়।

আগামীকাল সকালে যাবো। কালও সারাদিন আমি থাকব খাজুরাহে। ঘুরে ঘুরে রূপতীর্থকে দেখব। দেখব আপন মনে। পরশু সকালের বাস-এ রওনা হব ছতরপুর, সেখান থেকে সাগর। সৌরীনবাবুরাও সেদিন জবলপুর থেকে সাগর পৌঁছবেন।

কিন্তু আগামী দিনের কথা থাক, আজকের কথা বলে নিই। সন্ধ্যার সময় ফিরে গিয়েছি ট্যুরিস্ট্-বাংলোয়। সেখানে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি এই রাহিল জনতা হোটেলে। যেখানে বাসস্থানের এত অভাব, সেখানে একা অত বড় একটা ঘর দখল করে রাখা সমীচীন নয়। আগেই বলেছি এই জনতা হোটেলের ডরমিটরীতে শুধু 'সীট' পাওয়া যায়। জনপ্রতি ভাড়া মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা। ডানলোপিলোর বিছানা, বেড্-সাইড টেব্ল ও খাটের পাশে লোহার দেওয়াল-আলমারী নিয়ে এক-একটি সীট। আলমারীটি বেশ বড়। স্যুটকেস কিংবা কিট্‌ব্যাগ ভেতরে ভরে রাখা যায়। ডরমিটরীর সঙ্গেই লাগোয়া বাথরুম। খাওয়া ট্যুরিস্ট্-বাংলোর মতই। এক কথায় শস্তায় বেশ ভাল ব্যবস্থা।

আমার কিন্তু এখানে চলে আসার আরও একটি কারণ আছে। এই জনতা হোটেলে দৈনিক প্রায় শ'খানেক পর্যটক রাত্রিবাস করেন। আর তাঁদের মধ্যে বহু বিদেশী থাকেন। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সঙ্গে পরিচিত হবার আশায় আমি আজ এখানে এসেছি।

সে আশা বিফল হয় নি। ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। কিন্তু পথিকদের কথা বলার আগে পান্থনিবাসটির প্রসঙ্গ শেষ করে নিই।

চারিদিকে মাঠ, মাঝখানে একটি বেশ বড় নূতন দোতলা বাড়ি। সামনে

চমৎকার ফুলবাগান। বারান্দায় উঠে ডানদিকে 'রিসেপশন', সামনে অফিস ও ডাইনিং হল। বারান্দার পাশে পাশে দু-দিকেই ছোট-বড় ঘর। দোতলায়ও একই ব্যবস্থা। নিচে এবং ওপরে বিশখানি শয্যাবিশিষ্ট চারটি ডরমিটরী ও দশখানি ডাব্‌ল-বেড রুম নিয়ে পর্যটন বিভাগের এই পান্থনিবাস।

আমাদের ডরমিটরী ডানদিকের শেষ ঘর—বেশ বড় হলঘর। দরজার সোজাসুজি 'প্যাসেজ'—একেবারে ঘরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। প্যাসেজ-এর দু-পাশে হাসপাতালের মতো দু-সারি খাট। এখন ষোলখানি খাট রয়েছে। প্রয়োজনে আরও চারখানি পাতা যায়।

আমি ঠাঁই পেয়েছি বাঁদিকের সারিতে মাঝামাঝি জায়গায়। এখন ঘরে মাত্র চারজন পর্যটক রয়েছেন। তাঁরা সবাই বিদেশী। আমার পাশে পাশাপাশি দুখানি খাটে এক বৃটিশ দম্পতি—যুবক-যুবতী। যুবক বসে বই পড়ছে, আর যুবতী চোখ বুজে শুয়ে আছে। দুজনেরই মাঝারি গড়ন। মেয়েটি বেশ আলাপী তবে ছেলেটি বড়ই কম কথা বলে। কি করবে, বেচারী হাঁপানির রোগী। এখন নাকি বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।

তাই নিয়েই কিন্তু সে ঘুরছে অবিরত। দিনের বেলা তেমন অসুবিধে হয় না। তবে রাতে বড়ই কষ্ট। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মেয়েটি বলে রেখেছে—'ফ্যান্'টা কিন্তু বন্ধ করা চলবে না। নইলে 'জন্' রাতে একেবারেই ঘুমুতে পারবে না।

কাজটা খুব সহজ নয়, প্রথমত বেশ শীত, দ্বিতীয়ত ফ্যান্-টা ঠিক আমার মাথার ওপরে। তবু আপত্তি করতে পারি নি, আর তাই কম্বল গায়ে রাখতে হয়েছে।

আমার ঠিক উল্টোদিকের খাটে রয়েছে রবিন্‌সন—দীর্ঘদেহী ও স্বাস্থ্যবান জনৈক অস্ট্রেলিয়ান। বয়স বছর চল্লিশ। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। আমুদে ও মজার মানুষ। মিশুকও বটে। সে নিজেই আলাপ করেছে আমার সঙ্গে।

রবিন্‌সন পাঁচ মাস ধরে ভারত পরিক্রমা করছে। এখান থেকে এলাহাবাদ বারাণসী ও কলকাতা হয়ে নেপালে যাবে। কিন্তু তার আগে একটা ফুলহাতার সোয়েটার চাই। বিদেশে কে তাকে বানিয়ে দেবে। তাই তাকে উলবোনা শিখতে হয়েছে। এখন সে বসে বসে উল বুনছে। কয়েকদিনের চেষ্টায় বেশ তাড়াতাড়ি বুনতে পারছে।

রবিন্‌সনের পাশের খাটে রয়েছে একজন ক্যানাডিয়ান যুবক। রোগা ও

লম্বা, চোখে পুরু চশমা। সেও য়ুরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ সেরে মাস দুয়েক আগে ভারতে এসেছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে এখানে এসেছে। এখান থেকে দিল্লী যাবে, সেখান থেকে সিমলা।

আমার কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয় কানাডায় আছে শুনে সে ভারী খুশি। দুজনের ঠিকানাও নিয়েছে। দেশে ফিরে সে নাকি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে। ভারত যে তার বড় ভাল লাগছে।

এই যুবকটির পেশা শিক্ষকতা, কিন্তু নেশা ছবি আঁকা ও বাঁশি বাজানো। খাজুরাহে সে অনেকগুলো 'স্কেচ্' করেছে। কিছুক্ষণ আগে স্কেচ্‌গুলো আমাদের দেখিয়েছে। ভালই এঁকেছে। এখন সে বাঁশি নিয়ে বসেছে—বাঁশের বাঁশি। বেশ বাজাচ্ছে।

কিন্তু ক্যানাডিয়ান বংশীধারী বেশিক্ষণ সুরচর্চা করতে পারল না। তাকে থামতে হল। আমার ভারতীয় বন্ধুরা ঘরে ঢুকছে। তারা বয়সে তরুণ, পোশাকে আমেরিকান। হিন্দী সিনেমার গান গাইতে গাইতে তারা ভেতরে ঢুকল। মুহূর্তে নীরব পান্থনিবাস সরব হয়ে উঠল। আর তাই বেচারী ক্যানাডিয়ানকে নীরব হতে হল।

তরুণ বন্ধুরা কে কি করে বলতে পারি না, তবে ওদের সবারই কলেজের পাট শেষ করা উচিত। ওরা আটজন। আমার এবং রবিন্‌সনের পাশ থেকে শুরু করে বাথরুম পর্যন্ত সব কয়খানি খাট জুড়ে ওরা রয়েছে। গান থামিয়ে তাদের চারজন আমার পাশের খাটে এসে জড়ো হল, দুজন শেষদিকে একখানি খাটে বসে খাতা খুলে হিসেব আরম্ভ করল, আর দুজন গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

সহসা ক্যানাডিয়ান জিজ্ঞেস করে, "কটা বাজে?"

কি করবে বেচারী? ক'দিন আগে নাসিকের এক ধর্মশালায় তার ঘড়িটি চুরি গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার ভারত সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা হয় নি। বরং আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—চোর-জুয়াচোর তো সব দেশেই আছে। এটা যে সভ্যতার অভিশাপ।

কথাটা মেনে নিয়েও লজ্জার কবল থেকে মুক্তি পাই নি।

ঘড়ি দেখে বলি, "সাড়ে সাতটা বাজে।"

"তাহলে ডাইনিং হলে যাওয়া যাক।"

"কিন্তু সাড়ে আটটার আগে তো ডিনার পাবে না।" আমি মনে করিয়ে দিই।

"তা হোক্ গে। ওখানে একটু বসা যাবে। কাগজ-টাগজ পড়ে সময়টা কাটিয়ে দেব।" সে উঠে দাঁড়ায়।

ঠিকই করছে সে। এখন ডাইনিং হল আমাদের এই বেড-রুমের থেকে অনেক বেশি শান্ত। সেই শান্তির আশায় সে পলিয়ে যাচ্ছে নিজের ঘর থেকে।

বৃটিশ দম্পতির অবস্থাও সুবিধের নয়। ছেলেটি বই বন্ধ করেছে, মেয়েটি চোখ মেলেছে। মাঝে-মাঝেই সে অসহায় দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

অবিচলিত কেবল রবিন্সন। সে একমনে সোয়েটার বুনে চলেছে।

অবিচলিত আমার তরুণ প্রতিবেশীরা। ওরা নাগপুরের ছেলে। রেলওয়ে কনসেশন নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। এখন তাদের তর্কযুদ্ধের বিষয়বস্তু খাজুরাহের মিথুনমূর্তি। তারা কেবল আলোচনায় মধ্যেই বিষয়টাকে সীমাবদ্ধ রাখছে না। মাঝে-মাঝেই অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে 'ডেমনস্ট্রেশন' দিচ্ছে; সব চেয়ে লজ্জার বিষয় তারা ইংরেজীতেই বেশি কথা বলছে। খেয়াল করছে না যে এখানে একজন ইংরেজ মহিলা রয়েছে। এবং সে ওদের চেয়ে বয়সে বড়।

আর বোধ করি শুয়ে থাকতে পারল না মেয়েটি। সে উঠে বসল, স্বামীকে কি যেন একটু বলল। তারপরে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জন বেচারীও জিনিসপত্র গুছিয়ে লকার বন্ধ করে স্ত্রীকে অনুসরণ করল। ওরাও বোধ করি ডাইনিং-হলে আশ্রয় নিতে ছুটল।

তরুণ পর্যটকদের নির্লজ্জ কথাবার্তায় লজ্জা পাচ্ছি আমিও। কিন্তু অবস্থার বিপাকে আমাকেও নীরব থাকতে হচ্ছে। আমি চুপচাপ শুয়ে শুয়ে রবিন্সনের সোয়েটার বোনা দেখছি।

সেই জার্মান যুবক ও ফরাসী দম্পতি ফিরে এলেন এতক্ষণে। ফরাসীরা বয়সে প্রৌঢ়। ভদ্রলোক বিজ্ঞানী কিন্তু ভাস্কর্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাঁর স্ত্রী প্যারিতে একটি কলেজের শিক্ষিকা। দুজনেরই ভারী শান্ত স্বভাব।

জার্মান ঠিক উল্টো। সদা-চঞ্চল প্রাণময় যুবক। পেশায় আর্কিটেক্ট। প্রাচীন স্থাপত্যকলা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্যই সে ছ'মাস ধরে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সে সর্বদা হাফ্-প্যান্ট্ হাফ্-সার্ট পরে। এখনও কোন গরম জামা পরে নি। এরকম শীত নাকি ওদের দেশে গ্রীষ্মকালেও থাকে। তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর সারা মুখে দাড়ি। মুখখানি সুন্দর, স্বাস্থ্যটিও ভাল।

সে জুতো পায়ে দিয়েই বিছানার ওপরে ধপ করে শুয়ে পড়ল। ফরাসী ভদ্রমহিলা হাতের জিনিসপত্র একারে রেখে বাথরুমে চলে গেলেন। আর তাঁর স্বামী চুপচাপ বসে রইলেন নিজের খাটে। ওঁরা তিনজনেই ইংরাজী বোঝে এবং মোটামুটি বলতে পারে। কাজেই তরুণদের তর্কে ওদের ভারত-ভাবনা বদলে যাচ্ছে কিনা বলতে পারব না।

বাঁচা গেল। এবারে তর্ক থেমেছে। তাই বলে চেঁচামেচি থামে নি। কেবল বিষয় বদল হয়েছে। মন্দের ভাল।

তরুণ পর্যটকদের একজন বোধ করি কারও কাছে কিছু হাত-দেখা শিখে থাকবে। সে এখন বন্ধুদের ওপরে সেই বিদ্যে প্রয়োগ করছে। বলা বাহুল্য তার বিচার্যের বিষয় মেয়ে-ঘটিত। মানে যে-ছেলেটি যে-মেয়েটিকে চায়, সে তাকে পাবে কিনা? পাবে বললেই বন্ধুটি তার বিচারবিদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে। আর পাবে না বললেই প্রায় দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যাচ্ছে।

নায়িকারা সবাই গণকের পরিচিতা। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী করা তার পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া সংসারের সব দুষ্মন্তই যদি সব শকুন্তলাকে লাভ করতে পারে, তাহলে যে ভাগ্যগণনা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য প্রমাণ করতে গিয়েই হাতাহাতির যোগাড়।

গণক তখন বাধ্য হয়ে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করে পাত্রের পক্ষে রায়দান করছে। পাত্রী বেচারীর জন্য মায়া হচ্ছে। একটা 'আপীল' করার সুযোগ পর্যন্ত তার রইল না।

কিন্তু বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মক্কেলদের সঙ্গে ক্রমাগত মতবিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত গণৎকারকে বিষয় পাল্টাতে হল—পাড়ার মেয়েদের ছেড়ে বন্ধুদের আয়ুর শরণ নিতে হয়। একজন বন্ধুকে বলে, "তোর দুটো ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। আরেকটা ফাঁড়া রয়েছে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে। এটা কাটলে তুই হেসে-খেলে বিরাশি পর্যন্ত বেঁচে যাবি।"

তার তরুণ মক্কেল মোটেই বিচলিত হচ্ছে না। কারণ উনপঞ্চাশে পৌঁছতে তার এখনও উনত্রিশ বছর বাকি। কিন্তু কথাটা ভাল লাগে না আমার। আমি আগামী ফাল্গুনে উনপঞ্চাশে পড়ব। সংখ্যাটি ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডে যত নড়বড়ে, চিত্রগুপ্তের খাতায় হয়তো আজকাল আর ততটা নয়। এবং হস্তরেখা বিচারের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। তবু তো উনপঞ্চাশ! প্রৌঢ়ত্বে

পৌঁছবার পরিচিত পদধ্বনি। উনপঞ্চাশ থেকেই যে অনেকে উনপঞ্চাশ বায়ুর তাড়নায় তাড়িত হতে শুরু করেন।

ওদের সবাই কিন্তু এই দক্ষযজ্ঞের সামিল হয় নি। দুজন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে চারজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু বাকি দুজন এতক্ষণ ধরে একমনে হিসেব করেছে আর বার বার টাকা গুনেছে। মনে হচ্ছে এরা দলের ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার।

এবারে বোধ হয় হিসেবপত্র শেষ হল। তাই ম্যানেজার ওদের থামতে বলে। সবাই শান্ত হলে গম্ভীর স্বরে ক্যাশিয়ার বলে, "কাল সকালেই সাতনার বাস ধরতে হবে।"

"কেন?" সদস্যরা সবাই কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ।

"টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে।"

"ফুরিয়ে গিয়েছে!"

"হ্যাঁ। কাল এখানে থাকলে আর ফেরার পয়সা থাকবে না।"

"কিন্তু সেই দূরের মন্দিরটা যে দেখা হল না!" জনৈক তরুণ বোধ করি চতুর্ভুজের কথা বলতে চাইছে।

ম্যানেজার চড়া স্বরে বলে, "হবে কেমন করে? বেড়াতে তো আসিস নি, মাল টানতে বেরিয়েছিস। নইলে সবাই এক দিন থেকে সব মন্দির দেখে যায়, আর তোরা দু'দিন থেকেও দেখে উঠতে পারলি না।"

"কি আর হবে মন্দির-ফন্দির দেখে। সব মন্দিরই তো একরকম।" একবার থামে তরুণটি। তারপরে ম্যানেজারের একখানি হাত ধরে বলে, "তোর কথাই রাখব ভাই! কাল সকালেই বাস ধরব। কিন্তু আজ রাতে একটু 'স্যাংশন' কর। বেশি নয়, দু-পেগ্ করে।"

"প্লিজ, ম্যাঙ্গার প্লিজ!" আরও তিনটি তরুণ সমবেত কণ্ঠে অনুরোধ করে।

কিন্তু ম্যানেজার সম্মত হয় না। বলে, "কাল এখানকার বিল মিটিয়ে হাতে যা টাকা থাকবে, তাতে কোনরকমে নাগপুর ফিরে যাওয়া যাবে। আজ আর মাল-টাল হবে না।"

"মরে যাবো মাইরি! একেবারে মরে যাবো!"

"না, না। আজ আর হবে না। টাকা নেই।" ম্যানেজার তার সিদ্ধান্তে অবিচল।

কিন্তু মাল-ভক্তরাও নাছোড়বান্দা। তাদের একজন সুপারিশ করে, "তাহলে আজ রাতে 'ডিনার' নেবার দরকার নেই। 'মীল্'-এর টাকা দিয়ে চল্ মাল খেয়ে আসি।"

"আর 'নো-মীল্' করা যাবে না। অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, না খেলেও টাকা দিতে হবে।" ম্যানেজার প্রস্তাবটা বানচাল করে দেয়।

এবারে অপর একটি তরুণ মুশকিলআসান করে। সে বলে ওঠে, "আমার কাছে যে একটা একশ' টাকার নোট রয়েছে, সেটা হিসেব করেছিস ?"

"করেছি।" ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়, "ওটা তো 'খাজুরাহো ডল্‌স' কেনার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে।"

"গোলি মারো ডল্‌স! শালা, মাল খাওয়া যাচ্ছে না, আর বাড়ির লোকেদের জন্য পুতুল নিয়ে যাবো!" একজন তরুণ প্রায় গর্জে ওঠে।

আরেকজন যোগ করে, "চল্ চল্, ঐ পুতুলের টাকা দিয়েই মাল টেনে আসা যাক্। রাত আটটা বাজে।"

প্রস্তাবটা বোধ করি ম্যানেজারের খুব অপছন্দ নয়। হবার কথাও নয়। বাড়ির লোকের জন্য সুরসুন্দরীদের মূর্তি নিয়ে যাবার চেয়ে সুরাপান নিঃসন্দেহে মহত্তর কর্ম।

সেই মহৎ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। আর সেই সঙ্গে ঘরে আবার ফিরে এলো শান্তি। এবং মনে হচ্ছে অন্তত ঘণ্টাচারেক এই শান্তি স্থায়ী হবে। রাত বারোটার আগে ওরা ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু তারপরে ?

তারপরের কথা ভেবে মন-খারাপ করে লাভ নেই। আর মন-খারাপ করারই বা কি আছে ? বৈচিত্র্যময় খাজুরাহের বিচিত্র দর্শনার্থীদের দেখব বলেই তো আমি আজ ট্যুরিস্ট্-বাংলো ছেড়ে এখানে এসেছি।

অতএব রাত বারোটার ভাবনায় ব্যাকুল না হয়ে, এখন রাতের খাওয়া সেরে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক। ওরা ফিরে আসার আগে যতক্ষণ পারা যায় ঘুমিয়ে নেওয়াই উচিত হবে।

প্রস্তাবটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়। ফরাসী ভদ্রলোক বলেন, "আপনারা এগোন, আমরা আসছি।"

অস্ট্রেলিয়ান ও জার্মানের সঙ্গে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। এগিয়ে চলি ডাইনিং হলের দিকে।

## ॥ চোদ্দ ॥

আমার আশঙ্কা মিথ্যে হয় নি। নাগপুরের তরুণরা নিজেদের বারোটা বাজিয়ে রাত বারোটায় ফিরে এসেছিল। তবে তেমন মাতলামি করে নি। মনে হচ্ছে আটজনের মাতাল হবার পক্ষে একশ' টাকা যথেষ্ট নয়। মাতাল হতে পারার আগেই তাদের পকেট খালি হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য তারা আমাদের ঘুম ভাঙ্গাতে কসুর করে নি। দুম করে দরজা খুলেছে, দাম করে বন্ধ করেছে। আলো জ্বালিয়েছে, আরও টাকা দেয় নি বলে ম্যানেজারকে খিস্তি করেছে। তারপর কিছুক্ষণ খাট টানাটানি করে অবশেষে শুয়ে পড়েছে। আমাকে উঠে আলো নেভাতে হয়েছে।

ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য আমার তো আপসোস হওয়া উচিত নয়। ডরমিটরী হচ্ছে প্রকৃত পান্থশালা। পথিকদের জানব বলেই তো আমি গতকাল ট্যুরিস্ট্-বাংলো ছেড়ে জনতা হোটেলে এসেছি।

কিছুক্ষণ আগে ওরা বিদেয় হয়েছে। যাবার আগেও খুব জ্বালাতন করে গিয়েছে। তবে এখন ঘরে শান্তি ফিরে এসেছে। আর তাই আমার বিদেশী বন্ধুরা রাতের ঘুম পুষিয়ে নেবার চেষ্টায় রয়েছেন। তাঁরা সবাই ঘুমে অচেতন।

কিন্তু আমার পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। বাথরুম-পর্ব সেরে জামাকাপড় পরে নিই। তারপর ব্রেকফাস্ট্ করে বেরিয়ে আসি জনতা হোটেল থেকে। এ-যাত্রায় খাজুরাহে আজ আমার শেষ দিন। সুতরাং সময়টার সদ্ব্যবহার করে নিতে হবে।

'Lord Matangeswar Temple
( 9th Century ),
God of Transformation.'

ওয়েস্টার্ন গ্রুপ-এর গেটের দক্ষিণে আরেকটি গেট। তারই সামনে একখানি পাথরে খোদাই করা রয়েছে কথাগুলি। এটাই মাতঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দিরের প্রবেশ-তোরণ।

মাতঙ্গেশ্বর খাজুরাহের একমাত্র জীবিত মন্দির। মন্দিরদ্বার খুলে গিয়েছে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই মন্দির।

আগেই বলেছি, এ মন্দিরটিও পশ্চিমগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্মণা মন্দিরের দক্ষিণে, প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দুয়ের মাঝে দেওয়াল

ও কাঁটাতারের বেড়া। অর্থাৎ যে চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে হলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে পঞ্চাশ পয়সা প্রবেশমূল্য দিতে হয়, মাতঙ্গেশ্বরেকে তার বাইরে রাখা হয়েছে। এটি যে আজও শিবালয়—সবার এখানে অবারিত দ্বার।

গেট পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই বাঁদিকে অনেকখানি খোলা জায়গা—ভারী সুন্দর সবুজ সমতল। কিছু ফুলগাছ আর দুটি গোড়া-বাঁধানো বিরাট অশ্বত্থগাছ। তারা প্রান্তরের অনেকটা জুড়ে শীতল ছায়া ছড়িয়েছে।

প্রান্তরের শেষে মন্দির। সবটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বেশ উঁচু। কিন্তু কোথাও কোন মূর্তিমালা নেই। কারুকার্যও না থাকার মতো। রূপতীর্থের রূপসজ্জাহীন নিরলঙ্কার মন্দির। অথচ বেলে পাথরের তৈরি। অনেকের মতে এটি বেলে পাথরে নির্মিত খাজুরাহের প্রথম মন্দির। তাই গেটের লেখাটিতে বোধ হয় কিছু ভুল রয়েছে। নবম নয়, দশম শতাব্দীর মন্দির এটি। নবম শতকে খাজুরাহে বেলে পাথরের ব্যবহার জানা ছিল না। লক্ষ্মণার ঠিক আগের যুগে অর্থাৎ ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই মন্দির।

গড়ন অনেকটা ব্রহ্মা মন্দিরের মতো, তবে এটি তার চেয়ে অনেক উঁচু এবং বড়। তাছাড়া অন্যান্য বড় মন্দিরের মতো 'ব্যাল্‌কনী' রয়েছে মাতঙ্গেশ্বরে।

নয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে জগতী। বাঁদিকে এককোণে সিদ্ধিদাতা গণেশের উপবিষ্ট মূর্তি। ভক্তদের তেল ও সিঁদুরে চর্চিত গণপতি। দলে দলে ভক্ত আসছেন। ছেলেরা নীরবে, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে। সবাই সঙ্গে করে ফুল জল তেল ও দুধ নিয়ে আসছেন। তাঁরা প্রথমে গণপতির গায়ে একটু জল ঢালছেন। আগে বেটাকে ঠাণ্ডা করে পরে বাপের কাছে যাচ্ছেন। আরও পনেরো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তাঁদের উঠতে হচ্ছে মূল মন্দিরে।

আমিও উঠে আসি মন্দিরদ্বারে। দরজার ডানদিকে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিবপুরাণ পাঠ করছেন। ভক্তেরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁকে কিছু-না-কিছু দিচ্ছেন। কেউ চাল-ডাল কিংবা আটা, কেউ তরি-তরকারী, আবার কেউ বা মিষ্টি কিংবা দুধ।

লোহার দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। সিলিঙে সামান্য কিছু খোদাই কাজ, তবে দেওয়াল ও স্তম্ভগুলি কারুকার্য ও ভাস্কর্যহীন।

গর্ভগৃহের প্রায় সবটা জুড়েই গৌরীপট অর্থাৎ উঁচু বেদি। জনৈক পূজারী জানান—গৌরীপটের উচ্চতা ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি, আর সাড়ে চব্বিশ ফুট বর্গক্ষেত্রাকার মন্দিরের বিশ ফুট চার ইঞ্চি জুড়ে এই গৌরীপট।

গৌরীপটের ঠিক মাঝখানে পাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। সুদৃশ্য ও মসৃণ লিঙ্গমূর্তি। পূজারী আবার বলেন—লিঙ্গমূর্তির ব্যাস ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং এর উচ্চতা ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি।

লিঙ্গমূর্তির ঠিক সামনে পঞ্চমুখী মহাদেবের পেতলমূর্তি। ডানদিকে পাথরের হর-পার্বতী। তাঁদের ঠিক পিছনে পেতলের প্রকাণ্ড ত্রিশূল।

গৌরীপটের একপাশে দুটি তালা লাগানো বিরাট একটা কাঠের বাক্স রয়েছে। দুজন লোক গালা গালিয়ে বাক্সের তালা দুটিতে সীলমোহর করছে আর দুজন প্যান্ট-কোট পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

এই মন্দির এখন সরকারী সম্পত্তি। তাই বোধ করি ওঁরা প্রণামীর টাকা সদরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

ডানদিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি গৌরীপটের ওপরে। মাতঙ্গেশ্বর মহাদেবের মহামূর্তিকে স্পর্শ করি, প্রণাম করি, প্রদক্ষিণ করি।

দর্শনশেষে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে, নেমে আসি জগতীর ওপরে। লক্ষ্মণা মন্দিরের পাশে এসে দাঁড়াই। এখানে ভক্তদের ভিড়, ওখানে দর্শনার্থীদের। এখানে অখণ্ড নীরবতা, ওখানে বিচ্ছিন্ন মুখরতা। এখানে বার্ধক্য, ওখানে যৌবন। এখানে দাস্যরস, ওখানে মধুর। এখানে করুণ আর ওখানে হাস্যরস। এখানে শান্ত, ওখানে শৃঙ্গার। দুটিই অপরিহার্য। কারণ এর একটি বাদ দিলে অপরটি অসম্পূর্ণ। আর এরা দুয়ে মিলেই জীবন—মহাজীবন।

মাতঙ্গেশ্বর থেকে মিউজিয়ামে আসা গেল। আগেই বলেছি বাস স্ট্যাণ্ডের পাশেই মিউজিয়াম।

কলকাতাসহ ভারতের অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় খাজুরাহের মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া গত চারদিন ধরে তো অনেক মূর্তি দর্শন করেছি। তবু এসেছি, কারণ এখানকার অধিকাংশ সংগ্রহ বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে সংগৃহীত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট ডাবলু. ই. জার্ডিন খাজুরাহের বিভিন্ন ভগ্নস্তূপ থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ উদ্ধার করে একটা ঘেরা জায়গায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। আকাশতলে সংরক্ষিত এই সংগ্রহের নাম হয় 'জার্ডিন মিউজিয়াম'।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার সেই সংগ্রহশালা অধিগ্রহণ করেন। তখন থেকে এর নাম 'খাজুরাহো আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম'। জার্ডিন-এর নামটি

মুছে না ফেললেই বোধ করি ভাল ছিল। স্বাধীন হলেই কি অকৃতজ্ঞ হতে হবে?

১৯৬৬ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বাড়িটি নির্মাণ করে ভারত সরকারকে উপহার দিয়েছেন। ছোট বাড়ি হলেও কর্তৃপক্ষ নিদর্শনগুলো বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন।

যে টিকিট কেটে পশ্চিম মন্দিরগোষ্ঠীতে যেতে হয়, সেই টিকিটের বাকি অংশ দেখালেই ঢুকতে দেয় এখানে।

বাইরে সিঁড়ির দু-পাশে সিংহের সঙ্গে সংগ্রামরত চান্দেলা রাজবংশের সেই আদিপুরুষের দুটি মূর্তি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজা—এটাও একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। চৌকাঠের ওপরদিকে অর্ধনারীশ্বর নবগ্রহ সপ্তমাতৃকা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মূর্তি খোদিত। মনে হয় কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত শৈব মন্দির থেকে দরজাটি আনা হয়েছে।

দরজা পেরিয়ে একফালি ছোট বারান্দা। কয়েকটি মূর্তি রয়েছে এখানে।

বারান্দার পরেই সংগ্রহশালার প্রধান কক্ষ। এ ঘরে ঢুকে প্রথম যাঁর দিকে নজর পড়ল, তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ। সুবিশাল মূর্তি। পা-দুখানি ভেঙ্গে গিয়েছে। তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে গণপতি নৃত্যরত। তাঁর চোখ-মুখের ভাব, শুঁড় ও হাতের ভঙ্গি এবং ভুঁড়ির ভাঁজ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি নৃত্যবিভোর।

গণেশের ডানদিকে দণ্ডায়মান হরি-হর। চারখানি হাতের দুখানি ভেঙে গিয়েছে। মূর্তির ডানদিক বিষ্ণুর, বাঁদিক মহেশ্বরের। কারুকার্যময় অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের অন্যান্য আরাধ্যরা রয়েছেন তাঁদের পাশে পাশে। যেমন বিষ্ণুর দিকে রয়েছেন দশাবতার। আর শিবের দিকে আছেন ভৈরব গণেশ কার্তিক এবং নন্দী। শুধু তাই নয়, মূর্তির প্রভাবলী বা 'ফ্রেম্'-এর ওপরদিকে রয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ছোট মূর্তি। ধর্মীয় ঐক্য ও সহাবস্থানের অপরূপ প্রতীক এই হরিহর বিগ্রহ।

উমা-মহেশ্বরের আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি রমণীয় মূর্তি রয়েছে ঘরের উত্তর দেওয়ালে। আর আছে একজোড়া জৈন-দম্পতির মূর্তি।

ঘরের পশ্চিম দেওয়ালের দক্ষিণপ্রান্তে রাখা হয়েছে খাজুরাহে প্রাপ্ত একমাত্র বুদ্ধ মূর্তিটি। বুদ্ধাবতার ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্মের ওপরে উপবিষ্ট। পণ্ডিতরা অনুমান করছেন—এটি খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মূর্তি।

বড় ঘর থেকে বাঁদিকের ঘরে আসি। এ ঘরে জৈন এবং বৈষ্ণব গ্যালারি। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি রয়েছে এখানে। প্রথমে জৈন গ্যালারি দেখি।

দক্ষিণ দেওয়ালে জৈন শাসনদেবী মনোভেগার মূর্তি। দেবীর একখানি হাত মাত্র অক্ষত। সে হাতে পদ্মফুল। ভক্ত এবং সেবিকারা দেবীকে ঘিরে রেখেছেন। দেবীর বাহন অশ্বমূর্তি খোদিত রয়েছে তাঁর পায়ের কাছে।

এবারে নজর দিতে হল ঘরের উত্তর দেওয়ালে, জৈনদেবী মাতৃকার দিকে। তিনি চমৎকার পোশাক পরে একটি শিশু কোলে নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন।

মাতৃকাদেবীর পাশে একটু ওপরে জৈন নারী-পুরুষের যুগলমূর্তি। তাঁরা নাকি জনৈক জৈন তীর্থঙ্করের পিতামাতা। দুটি শিশু কোলে নিয়ে দুজনে একটা গাছতলায় বসে রয়েছেন।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জৈনমূর্তি রয়েছে এখানে। রয়েছে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের দণ্ডায়মান দিগম্বর-মূর্তি। তাঁর অবশ্য একখানি হাত ভেঙে গেছে। রয়েছে জৈনদেবী অম্বিকা এবং আরও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তি।

এবারে বৈষ্ণব গ্যালারির দিকে আসি। প্রথমেই নজর পড়ে বৈকুণ্ঠরূপী বিষ্ণুর দিকে। তার এক দেহ কিন্তু চারখানি মুখ—নৃসিংহ বরাহ হয়গ্রীব (ঘোড়া) এবং নারায়ণ।

শেষশায়ী বিষ্ণু এবং ভূ-বরাহের মূর্তি দুটিও ভাল লাগে আমার। ভূ-বরাহের মুখখানি বরাহের হলেও দেহটি দেবতার।

ভাল লাগে লক্ষ্মীনারায়ণ, গঙ্গা ও দশাবতারের মূর্তি। ভাল লাগে গজেন্দ্র মোক্ষরূপী বিষ্ণু এবং সূর্যমূর্তি। গজেন্দ্র-মোক্ষরূপী বিষ্ণু সর্পরূপী গ্রহের কবল থেকে হাতিরাজ গজেন্দ্রকে রক্ষা করছেন।

সূর্যমূর্তিটি রয়েছে ঘরের দক্ষিণ দেওয়ালে। দণ্ডায়মান মূর্তি, পায়ে পাদুকা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন—দণ্ডী পিঙ্গল উষা, প্রতি-উষা এবং অশ্বিনীকুমারগণ। আর মূর্তির বেদিতে সূর্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথ এবং সারথি অরুণের মূর্তি খোদিত।

আবার বড় ঘর পেরিয়ে অপর ঘরখানিতে আসি। এটি শৈব এবং বিবিধ গ্যালারি। ঘরের একদিকে রাজা-রাণী ও কয়েকজন সুরসুন্দরী। রয়েছে শিকার ও যুদ্ধের দৃশ্য এবং কিছু মিথুনমূর্তি।

শৈব গ্যালারিতে সবার প্রথম নজর পড়ে পার্বতীর দিকে। দণ্ডায়মানা অপরূপা মূর্তি।

পার্বতীকে প্রণাম করে তাঁর স্বামীর সামনে আসি। এটি শিবের অন্ধকাসুর-

বধ-মূর্তি। রুদ্রের ত্রিশূল অন্ধকাসুরকে বিদ্ধ করেছে। ত্রিলোচনের চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে।

এক এক করে অন্যান্য মূর্তি দেখতে থাকি। দর্শন করি সদাশিবকে। তাঁর চার পা এবং ছয় মাথা। একটি পায়ের ওপরে ব্রহ্মামূর্তি খোদিত।

দেখি মহিষমর্দিনী ও সপ্তমাতৃকার মূর্তি, কার্তিক গণেশ বিঘ্নেশ্বরী এবং অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি। দর্শন করি চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী এবং উমা-মহেশ্বরকে।

তারপরে বেরিয়ে আসি মিউজিয়াম থেকে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ হল না। ভেবেছিলাম এখুনি চৌষট্টিযোগিনী ও লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দির দুটি দর্শন করে নেব। তা আর হয়ে উঠল না। বেলা একটা বাজে। হোটেলে ফেরা দরকার। নইলে কিচেন বন্ধ হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। চলতে চলতে ভাবছি সিংহের সঙ্গে সংগ্রামরত চান্দেলা রাজবংশের প্রতীক মূর্তিটির কথা। একটু আগে মিউজিয়ামের সামনেও তার দুটি মূর্তি দেখে এলাম। এই মূর্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য জানা নেই আমার। শুধু জানি রূপকথায় এর উল্লেখ রয়েছে।

রূপকথা ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসের রূপকার—বিশেষ করে মধ্যভারতে। যে রূপকথা মধ্যভারতের ইতিহাস রচনায় সবিশেষ সাহায্য করেছে, তার নাম পৃথ্বীরাজ রাসো। সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের বীরজীবনের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত এই গীতিকাব্য। কিন্তু এর মধ্যে বহু প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী রয়েছে।

পৃথ্বীরাজ রাসোয় বলা হয়েছে আকাশের দেবতা চন্দ্রের ঔরসে মাটির মানবী হেমবতীর গর্ভে চন্দ্রবর্মনের জন্ম হয়। তিনিই চন্দ্রাত্রেয় বা চান্দেলা রাজবংশ ও রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

হেমবতী ছিলেন অসাধারণ রূপসী ও ব্রাহ্মণকন্যা কিন্তু বালবিধবা। সমাজের অত্যাচার ও যৌবনের জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি যখন কুমুদসরোবরে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তখুনি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে নিশানাথ মর্ত্যে নেমে আসেন—মিলিত হন হেমবতীর সঙ্গে।

হেমবতী আর পিত্রালয়ে ফিরে যান না, বনবাসিনী হয়ে পুত্র চন্দ্রবর্মণকে মানুষ করতে থাকেন। চাঁদের মতো রূপ ও স্বাস্থ্য নিয়ে চন্দ্রবর্মণ বড় হতে থাকেন। পনের বছর বয়সে তিনি খালি হাতে একটা সিংহ বধ করেন।

তারপরে পিতার অস্ত্র ও স্পর্শমণির সাহায্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য ও সুরম্য নগরী স্থাপন করেন।

রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে চন্দ্র ও সূর্য বংশের উল্লেখ আছে। রামায়ণ সূর্যবংশের কাহিনী, মহাভারত চন্দ্রবংশের। কিন্তু মহাভারত কিংবা কোন পুরাণে নিশানাথ ও হেমবতীর এই প্রণয়কাহিনী নেই। এটি আছে পৃথ্বীরাজ রাসোর মাহোবা খণ্ডে আর রয়েছে মধ্যভারতের লোকগাথায়। লোকগায়করা আজও সে কাহিনী গ্রাম-গ্রামান্তরে গেয়ে গেয়ে ফিরছে।

## পনেরো

চড়া রোদ। তবু স্নান-খাওয়া সেরে নিয়েই আবার পথে নেমেছি। আমি যে পথিক। ঘর পথিকের জন্য নয়, পথই পথিকের পরম আশ্রয়।

তাছাড়া আমার যে অদ্যই শেষ রজনী। আগামীকাল সকালে বিদায় নিতে হবে রূপতীর্থের কাছ থেকে। তাই যতক্ষণ পারি তীর্থ-দর্শন করে নিই।

সেই একই রাস্তা ধরে মিউজিয়ামের দিকে চলেছি। চলেছি চৌষট্টি-যোগিনী এবং লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দিরে।

তখুনি মিউজিয়ামের সামনে এবং তে-রাস্তার মোড়ে মানুষ জড়ো হতে দেখেছি। নানা পোশাকের নানা বয়সের মানুষ—নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা। ভেবেছি হাট বসবে।

বসতেই পারে। খাজুরাহো গ্রাম যতই জরাজীর্ণ হোক, খাজুরাহো বলতে এখন একটি শহর বোঝায়। সেই শহরের কেন্দ্র এই মন্দির আর হোটেল এলাকা। সাতটি 'ব্লক্' নিয়ে এই শহর। আয়তন ১৬·৯৩ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৭২৩ জন। তাঁদের মধ্যে ১২২০ জন নারী। তাঁরা ৫২৭টি বাড়িতে ৫৮৫টি পরিবারে বিভক্ত। এঁদের মধ্যে মাত্র ৫২৪ জন পুরুষ ও ১৩৮ জন নারী লিখতে ও পড়তে পারে। সুতরাং খাজুরাহো খুব ছোট জায়গা নয়। এখানে হাট বসতেই পারে।

কিন্তু না, এ তো সাধারণ হাট নয়। এ যে দেখছি লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে দোকান আর ক্রেতাদের ভিড়। ব্যাপারটা কি? মেলা-টেলা নাকি?

জনৈক পথচারী জানান—আমার অনুমান মিথ্যে নয়। মকর-সংক্রান্তির মেলা বসেছে।

মকর-সংক্রান্তি! পৌষ-সংক্রান্তি! যে দিনটিতে বাংলার বহু গ্রাম ও গঞ্জে মেলা বসে? মেলা বসে কেঁদুলি আর গঙ্গাসাগরে?

হ্যাঁ, সেই একই তিথিতে একই মেলা বসেছে খাজুরাহে। কোথায় বীরভূম আর কোথায় ছতরপুর! কোথায় গঙ্গাসাগর আর কোথায় খাজুরাহো! অথচ সনাতন সংস্কৃতির সেই অক্ষয় সূত্রে তারা আজও গ্রথিত। এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশে না থেকে বাংলায় থাকলেও আমি এমনি মেলা দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম এমনি সহজ সরল ও হাসিখুশি মানুষ। তাদের পোশাক পৃথক, ভাষা ভিন্ন, তবু তাদের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য নেই।

ভাবতে ভাল লাগছে, ঐক্যের ফল্গুধারা আজও আসমুদ্র হিমাচলকে প্লাবিত করছে। আর তাই গঙ্গাসাগরের মতো এখানেও মেলা বসেছে—মিলনমেলা।

শিবসাগরের ঘাটে আর তীরে তীরে মেলার ঢেউ এসে আছাড় খেয়েছে। বড় রাস্তার ভিড় ঠেলে শিবসাগরের তীরে আসি, আর একবার মেলা দেখি। তার পরে মেলার বিশ্রামরত মানুষদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলি চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরের দিকে।

মিনিট কয়েক পথ চলার পরেই মেলার ভিড় মিলিয়ে যায়। আজ খাজুরাহে এত মানুষ, তবু এ পথ জনহীন। যারা মেলায় এসেছে, তাঁদের প্রায় সবাই কেনাকাটার ফাঁকে মাতঙ্গেশ্বর দর্শন করেছে। অনেকে লক্ষ্মণা-কাণ্ডারিয়া-বিশ্বনাথ দেখেছে, এমন কি পার্শ্বনাথও ঘুরে এসেছে, কিন্তু কেউ এ পথে আসে নি। পর্যটকরাও আসেন না। অথচ চৌষট্টিযোগিনী খাজুরাহের প্রাচীনতম মন্দির। এটিও পশ্চিমগোষ্ঠীর অন্যতম এবং দূরত্ব বড় রাস্তা থেকে কিছুই নয়।

এই তো মন্দিরের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। নবম শতাব্দীর মন্দির। তখন খাজুরাহের মানুষ বেলে পাথরের ব্যবহার জানতেন না। তাই গ্র্যানিট্ পাথরে তৈরি ভাস্কর্যহীন মন্দির।

জগতী কিন্তু খুবই উঁচু, প্রায় আঠার ফুট। আকারেও বেশ বড়—১০৪ ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রশস্ত। সেকালে নাকি এই জগতীর ওপরে পঁয়ষট্টিটি ছোট ছোট মন্দির ছিল। এখন মাত্র তার চল্লিশটির মতো টিকে আছে কোনমতে।

সিঁড়ির সোজাসুজি জগতীর শেষপ্রান্তে গর্ভগৃহ এবং এটি সব চেয়ে বড় ঘর

—মন্দির। সাধারণত যোগিনী মন্দির গোলাকার হয়ে থাকে, অথচ এ মন্দিরটা দেখছি চৌকো। এটি নাকি বর্তমান ভারতের প্রাচীনতম যোগিনী মন্দির।

তিনটি দর্শনীয় মূর্তি এখনও রয়ে গিয়েছে এই প্রায়-পরিত্যক্ত মন্দিরে। তাঁরা—ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী এবং মহিষমর্দিনী। এঁরা খাজুরাহের প্রাচীনতম বিগ্রহের অন্যতম।

তাঁদের দর্শন করি, প্রণাম করি।

তারপরে নেমে আসি মন্দির থেকে। সেই মাটির পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দিরের দিকে।

চৌষট্টিযোগিনীর পশ্চিমে একটি প্রাচীন সরোবরের তীরে লালগুঁয়া মহাদেব মন্দির। সরোবরের নামও লালগুঁয়া সাগর। নামেই সাগর, আসলে একটি মজে যাওয়া দিঘি।

চৌষট্টিযোগিনী থেকে প্রায় আধ মাইলের মতো পথ পেরিয়ে পৌঁছনো গেল মন্দিরের সামনে।

গ্র্যানিট্ ও বেলে পাথরে তৈরি। তাই পণ্ডিতদের অনুমান এটি চৌষট্টি-যোগিনীর পরে ও লক্ষ্মণার আগে নির্মিত। নির্মাণকাল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে এ মন্দিরের। খাজুরাহের দুটি মাত্র পশ্চিম-মুখী মন্দিরের এটি একটি। অপরটি আগেই দেখেছি—চতুর্ভুজ মন্দির।

উঠে আসি জগতীর ওপরে। সামনের অংশটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। কেবল গর্ভগৃহটি দাঁড়িয়ে আছে কোনমতে।

গর্ভমন্দিরের সোজাসুজি খানিকটা দূরে উঁচু বেদির ওপরে নন্দীমূর্তি। বাহন বাহকের দিকে তাকিয়ে আছে—ভক্ত ভগবানকে প্রণাম করছে।

আমরাও প্রণাম করি। প্রণাম করি লালগুঁয়া মহাদেবকে, সত্য-সুন্দর শিবকে।

তারপরে নেমে আসি মন্দির থেকে। সেদিন সকালে সবার সঙ্গে পশ্চিম-মুখী চতুর্ভুজ নারায়ণ মন্দির থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ বিকেলে একাকী এই পশ্চিম-মুখী লালগুঁয়া মহাদেব মন্দিরে তা শেষ করলাম। বিষ্ণুকে প্রণাম করে যে রূপতীর্থ দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল, মহেশ্বরকে প্রণাম করে তার সমাপ্তি ঘটল। শেষ হল আমার রূপতীর্থ খাজুরাহো পরিক্রমা।

না, শেষ হয় নি। রূপদর্শনের কি শেষ আছে?

ঘড়ির দিকে তাকাই। সবে বিকেল চারটে। রূপতীর্থে আঁধার নেমে

আসতে আরও অন্তত ঘণ্টা দুয়েক দেরি আছে। সূর্যের শেষ শিখাটি মিলিয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমি রূপদর্শন করব। আবার যাবো লক্ষ্মণা কাণ্ডারিয়া জগদম্বা চিত্রগুপ্ত ও বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে।

ফিরে আসি বড় রাস্তায়। সাড়ে চারটা বাজে। হাতে সময় নেই। তবু এক কাপ কফি খেয়ে নিলে হত। ঘণ্টাদুয়েক ধরে রোদে ঘুরছি।

মেলার ভিড় ঠেলে 'সাউথ ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়' আসি। একখানি খালি চেয়ারে বসে পড়ি। বেয়ারাকে এক কাপ নেসকাফে দিতে বলি।

দুটি ইংরেজ যুবক-যুবতী আমার সামনে বসে আছে। দুজনেই দেখতে সুন্দর, তার মধ্যে তরুণীটি অপরূপা।

তবে ওরা বড়ই বিরক্ত। ঘোরাঘুরি করে খিদে পেয়েছে। শ্রান্ত ও ক্ষুধার্থ হয়ে খাবারের দোকানে এসেছে। কিন্তু 'মেনু বোর্ড' দেখে যে খাবারটাই খেতে চাইছে, ম্যানেজার মাথা নেড়ে বলছে—পাওয়া যাবে না।

মেনুবোর্ডে বাষট্টিটি খাবারের নাম লেখা রয়েছে। সুতরাং ওরা আবার সেটি দেখছে মনযোগ দিয়ে। দুজনে আলোচনা করে ছেলেটি অন্য একটি খাবার চাইছে। আর ম্যানেজার একই ভাবে মাথা নেড়ে একই কথা বলছে—পাওয়া যাবে না।

এইভাবে আরও কয়েকবার তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করার পরে ম্যানেজার বলতে বাধ্য হয়—এক, দুই ও তিন নম্বর খাবার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না আর পানীয় বলতে কফি।

—তাহলে এত সব খাবারের নাম লিখে রেখেছো কেন? তরুণী রীতিমত রেগে গিয়েছে।

কিন্তু ম্যানেজার মৃদু হাসে, তার প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না সে। কি বলবে? ঐ খাবারের নামগুলো যে লেখার জন্যই লেখা, খাবার জন্য নয়—এ কথাটি বিদেশী ট্যুরিস্ট্‌দের কাছে সে বলে কেমন করে?

আমার কফি আসে। ওরা উঠে দাঁড়ায়। পেটে খিদে নিয়েই বেরিয়ে যায় রেস্তোরাঁ থেকে।

আবার সেই টিকিট কাউণ্টার। চারদিনে এই নিয়ে পাঁচবার টিকেট কাটলাম। বুকিং ক্লার্ক ও গেটকীপারদের আমি মুখচেনা হয়ে গিয়েছি। ওরা তাই আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। কি ভাবল কে জানে? আবার পাগল ভাবল না তো!

ভাবতে পারে। সবাই একবার দেখে চলে যায়, আর আমি কিনা বার বার আসছি। আসছি আর আসছি। অথচ আমি ছবি আঁকছি না, এমন কি তেমন ছবিও তুলছি না। শুধুই দেখছি। তাও তো এরা জানে না, আমি গত বছর এসেও দুবার দেখে গিয়েছি।

আমি আবার দেখি। যেমন করে গত বছর দেখে গিয়েছি, যেমন করে গত কয়েকদিন ধরে দেখছি, তেমনি করে আবার দেখি। সেই দেখতে দেখতে পরিক্রমা করা, পরিক্রমা করতে করতে নিজের অলক্ষ্যে থেমে যাওয়া, কোন দেব-দেবী কিম্বা সুরসুন্দরীর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকা। সম্বিত ফিরে এলে আবার এগিয়ে চলা। সেই লক্ষ্মণা থেকে শুরু আর বিশ্বনাথ দর্শনে শেষ। মাঝখানে কাণ্ডারিয়া জগদম্বা আর চিত্রগুপ্তে সূর্যপ্রণাম।

আগেই বলেছি, আমি স্থপতি কিম্বা ভাস্কর নই, চিত্রশিল্পী অথবা আলোক-চিত্রকরও নই। তবু আমি বার বার রূপতীর্থকে দেখছি দেখছি আর দেখছি। এ দেখা যে মনের তাগিদে, অন্তরের আহ্বানে। এ দেখার শেষ নেই।

তবু শেষ করতে হয়। পার্থিব কোন কিছুই অশেষ নয়। শেষ হয়েছে চান্দেলা রাজত্ব। যাঁরা এই রূপতীর্থের রূপকার তাঁরাও আজ আর কেউ নেই এ জগতে।

কেবল রয়ে গিয়েছে খাজুরাহো। সে যে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী, মর্ত্যের জনপদ হয়েও স্বর্গীয় সম্পদে সম্পদশালী। তাই যুগ-যুগান্ত ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমারই মতো ছুটে আসবে এই রূপতীর্থে। রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে তারা অরূপ-রতন পেতে আসবে।

আমি পাই নি। আমি শুধু আমার জীর্ণ তরী ভাসিয়ে রূপ-সাগরের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছি। দেখেছি আর দেখেছি। দু-চোখ ভরে শুধুই দেখেছি।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাচলের বুকে। দিবাকরকে আর দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। সে চলে গিয়েছে কাণ্ডারিয়ার আড়ালে। কেবল তার সোনালী আলোয় মন্দিরশিখরটিকে রক্তিম করে রেখেছে।

আর কিছুক্ষণ। তারপরেই অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ শিখাটি যাবে মিলিয়ে। আঁধার নেমে আসবে খাজুরাহোর মাটিতে আর রূপতীর্থের মন্দিরে মন্দিরে। খাজুরাহোর ইতিহাসে আর একটি দিন যুক্ত হবে। এমনি এক-একটি দিন করে সে হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে এবং এইভাবে সে আরও হাজার হাজার বছর রইবে বেঁচে—সুন্দরের মৃত্যু নেই।

কিন্তু আমি? আমি তো খাজুরাহোর মতো অবিনশ্বর নই! আমার পরমায়ু থেকে যে এইমাত্র একটি দিন বিযুক্ত হল—জীবনের মালা হতে একটি ফুল পড়ল খসে!

তবু কোন বেদনা বোধ করছি না। আজ যে আমার ভ্রষ্ট-জীবনের একটি সুন্দর দিন, আনন্দের দিন, সার্থক দিন! এমন দিন জীবনে বড় বেশি আসে না। তাই তীর্থ-দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করি—হে সুন্দর! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি যেন এমনি সুন্দর দিনের মধুময় স্মৃতিতে বুক ভরে নিয়ে জীবনের পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করতে পারি।

আর বিদায় নেবার আগে এই গোধূলিবেলায় অস্তাচলগামী অংশুমানকে বলে যাই—অনন্তকাল ধরে খাজুরাহোকে তুমি আজকের মতই আলোময় করে রেখো। শত-সহস্র রূপ-পিয়াসী তোমার আলোয় রূপতীর্থকে দর্শন করে আমারই মতো আনন্দিত হোক। তাদেরও আমার মতো পুণ্য হোক, তারাও আমার মতো ধন্য হোক।

---